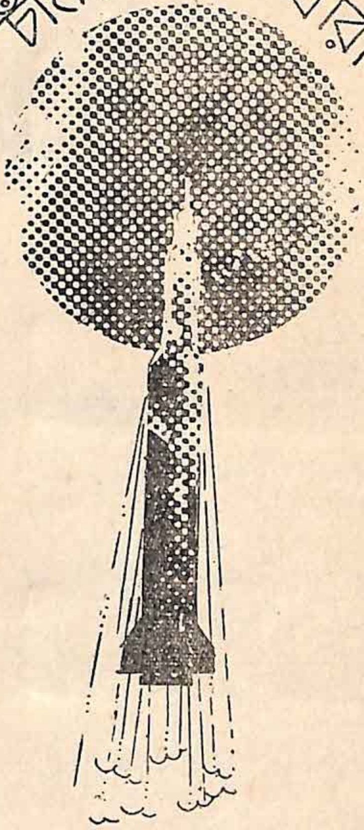


চাঁদে যাবেন যাঁরা

ড: বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

চাঁদে যাবেন যাঁরা



চাঁদে যাবেন যারা

ডক্টর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ—আষাঢ়, ১৩৭৬

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
অনিলকুমার ঘোষ
শ্রীহরি প্রেস
১৩৫এ, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদ-শিল্পী
রবীন দত্ত

চার টাকা

শুনেছি একদিন চাঁদের দেহ ঘিরে
ছিল হাওয়ার আবর্ত।
তখন ছিল তার রঙের শিল্প,
ছিল সুরের মন্ত্র,
ছিল সে নিত্যনবীন।
দিনে দিনে উদাসী কেন ঘুচিয়ে দিল
আপন লীলার প্রবাহ।
কেন ক্লান্ত হোলো সে আপনার মাধুর্যকে নিয়ে।
আজ শুধু তার মধ্যে আছে
আলোছায়ার মৈত্রীবিহীন দ্বন্দ্ব—
ফোটে না ফুল
বহে না কলমুখরা নির্ঝরিণী॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিবেদন

'চাঁদে যাবেন যাঁরা' প্রকাশের মুহূর্তে সকলের আগে কৃতজ্ঞতা জানাই 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র সম্পাদিকা শ্রীমতী জয়ন্তী সেনকে এবং এই সাপ্তাহিকের সহকারী সম্পাদক শ্রীদুর্গাদাস সরকার ও শ্রীদিলীপ চক্রবর্তীকে।

প্রধানতঃ শ্রীদিলীপ চক্রবর্তীর অনুপ্রেরণায় 'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে বিজ্ঞান নিয়ে লিখতে সুরু করি এবং এই 'চাঁদে যাবেন যাঁরা'র সবটুকু অংশই উল্লিখিত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

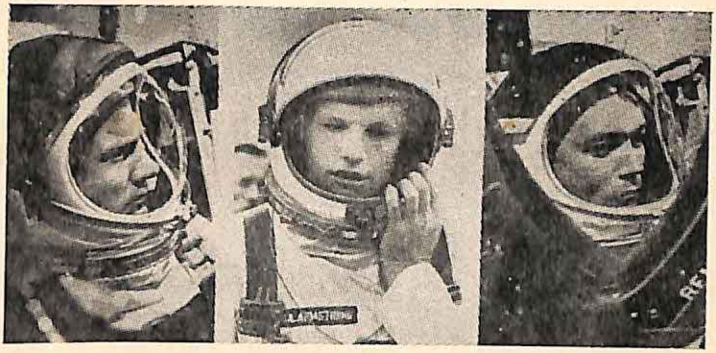
চাঁদ-অভিযান-সম্পর্কিত প্রায় যাবতীয় তথ্যই এ-গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হল; এবং পরিশিষ্টে দেওয়া হল মহাকাশ-অভিযানের যে তালিকাটি, আশা করি, রসিকদের তা' কাজে লাগবে।

চাঁদ-সম্পর্কিত তথ্যাদি ও ছবি পাঠিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন শ্রদ্ধেয় শ্রীভূষণচন্দ্র দাস এবং কলকাতার সোভিয়েত ও মার্কিন 'ইন্‌ফরমেশন্ সার্ভিস'। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণ করি মার্কিন 'ইন্‌ফরমেশন সার্ভিস'-এর শ্রীদেবব্রত রায়চৌধুরী, শ্রীশিবপদ সেন ও শ্রীঅমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তার কথা এবং সোভিয়েত সার্ভিস-এর শ্রীসিদ্ধেশ্বর সেনের সহযোগিতার কথা।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

প্রীতিভাজনেষু



নেইল এ. আর্মস্ট্রং (মাঝে), কর্ণেল এডুইন. ই. আলড্রিন (বামে) লে. কর্ণেল মাইকেল কলিনস (ডানে)—১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে এই তিনজন চাঁদে নামবেন।



চাঁদের কাছ থেকে পৃথিবীর দৃশ্য
(অ্যাপেলো-৮ থেকে গৃহীত)



চাঁদ-অভিযাত্রী রকেট অ্যাপেলো—১১



প্রথম মহাকাশচারী য়ুরি গ্যাগারিন (১৯৩৪-১৯৬৮)



প্রথম ও একমাত্র মহিলা মহাকাশচারী
ভ্যালেন্‌টিনা তেরেশকোভা

চাঁদে যাবেন যাঁরা

॥ এক ॥

এ্যাড্‌ভান্স্‌ বুকিং 'অফিসিঅ্যালি' এখনও ঠিক সুরু হয় নি ; কিন্তু লাইন এরই মধ্যে পড়ে গেছে। এরই মধ্যে উৎসাহীদের কেউ কেউ শুধোচ্ছেন, আর দেরি কত ? চাঁদ-পর্যটন কবে সুরু হবে ?

উদ্যোক্তারা বলছেন, সুরু হল বলে। আর কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরুন শুধু। তার পরেই মহাকাশযানে চেপে মহানন্দে চাঁদে পাড়ি দেবেন।

এদিকে চাঁদের পরিবেশ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা সুরু হয়েছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, সে দেশের বিচিত্র পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানুষ নিজেকে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারবে তো ? জল-বাতাস নেই সেখানে ; গাছপালা নেই। দিনে সেখানে প্রচণ্ড গরম ; আর রাত্রে মারাত্মক শীত। এমন দেশে বাঁচতে পারবে তো মানুষ ? এ ছাড়া চাঁদের স্বল্প মাধ্যাকর্ষণশক্তি কী ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তার দেহে ? চাঁদে গিয়ে কেমন করে চলাফেরা করবে সে ? ঘুমোবে কেমন করে ? দেখবে কতটুকু ? খাবে কী ?—এবং এ সব কিছুর চেয়েও বড় কথা, পৃথিবীর মতো বায়ুমণ্ডল নেই চাঁদে। অতএব, কে সেখানে মানুষকে কস্‌মিক রশ্মির আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে ? আর রক্ষা যদি কোনমতে সে পায়ও, তো সেখানে গিয়ে তার মানসিক অবস্থাটা কেমনতরো হবে ?

এই ধরণের হাজার প্রশ্ন আজকের চাঁদে-পাওয়া মানুষদের

ভাবিয়ে তুলেছে। তাই বাধ্য হয়েই তারা ধরনা দিচ্ছেন মুশকিল-আসান বিজ্ঞানীদের কাছে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, কোনো চিন্তা নেই। সব সমস্যারই সমাধান হল বলে। কারণ, অভয়মন্ত্র জানা আছে আমাদের।

আমরা বলি, ভাল কথা। মন্ত্রগুলোর ভাষ্য রচনা করা যাক তবে। দেখা যাক্, সত্যি এদের মধ্যে কোন তাৎপর্য আছে কি না।

চাঁদে বসবাসের কথা বলতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা প্রথমেই 'সাবমেরিন'-এর দোহাই দেন। বলেন, দীর্ঘকাল ধরে জলের তলায় থাকবার সময় 'সাবমেরিন'-এর বাসিন্দারা যেমন, চন্দ্রের অভিযাত্রীরাও অনেকটা ঠিক তেমনি মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হবে। তাই চন্দ্রের জীবনযাত্রা সাবমেরিন-যাত্রীদের মতোই অতি সূক্ষ্ম পরিকল্পনামাফিক চলা উচিত। কখন কাজ করব, ঘুমোব কখন, কখনই-বা বিশ্রাম করব,—এই সব কিছুর ছক পৃথিবীর সঙ্গে যতদূর সম্ভব সঙ্গতি রেখে রচনা করা উচিত। যদিও চন্দ্রের এক-একটি দিন আমাদের পৃথিবীর ১৪টি করে দিন-রাত্রির সমান এবং তার রাত্রির দৈর্ঘ্যও ঠিক একই রকম, তাই বলে ভুলে গেলে চলবে না যে, আমরা পৃথিবীর অধিবাসী। পৃথিবীর মাপে ১৪টি দিন রাত্রি একনাগাড়ে যেমন আমরা ঘুমোতে পারি না, ঠিক তেমনি ঐ পরিমাণ দীর্ঘ সময় জুড়ে একটানা কাজ করতেও আমরা অনভ্যস্ত। কুম্ভকর্ণ আমাদের মধ্যে একজনই ছিলেন এবং রামায়ণের যুগ থেকে বাকী সকলেই এক-একটি করে দিন-রাত্রিকে ২৪ ঘণ্টার মাপে দেখে আসছেন। অতএব, চাঁদে গিয়েও মানুষের এই সাবেকী অভ্যেসটাকেই কাজে লাগাতে হবে। ওখানকার এক-একটি দিনকে চৌদ্দটি করে দিন এবং চৌদ্দটি করে রাত্রিতে বিভক্ত করে নিয়ে জীবনযাত্রা চালাতে হবে। অনুরূপভাবে চাঁদের এক-

একটি রাত্রিকেও ভাগ করে না নিয়ে উপায় নেই। অতএব দেখছি, চাঁদের দেশে গিয়ে ওখানকার হিসেবে কেউ যদি একদিন থাকেন তো আমাদের পৃথিবীর হিসেবে ২৮ দিন পেরিয়ে যাবে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, তা' যাক। চাঁদের দিন-রাত্রিকে নিয়ে ভাবনার কিছু নেই; আসল ভাবনা কসমিক রশ্মিকে নিয়ে। এই রশ্মি চাঁদযাত্রীদের আবাসস্থল এবং স্পেসস্যুট-এর মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। দেখতে দেখতে সর্বনাশের ফাঁদ পাততে পারে সে সব জায়গায়। অবশ্য সন্দেহ নেই যে, আবাসস্থলের দেওয়াল এবং স্পেসস্যুটে মিলে কমসিক রশ্মির বেশ খানিকটা শোষণ করে নেবে; কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়, ঐসব আবরণের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে রশ্মি যে পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে, তা থেকে চাঁদ-পর্যটকরা পরিত্রাণ পাবেন কি? বিজ্ঞানীদের ধারণা, পরিত্রাণ হয়তো না-ও পেতে পারেন। কসমিক রশ্মির দৌলতে মানুষের কোষগ্রন্থির ক্ষতিটা অপূরণীয় হতে পারে। তবে এ নিয়ে স্থির কোন সিদ্ধান্ত এখনও অবধি কেউ করেন নি। সবাই গবেষণার ফলাফলের দিকে তাকিয়ে আছেন।

এদিকে অন্য এক সমস্যা দেখা দিয়েছে সূর্যদেহের বিস্ফোরণকে নিয়ে। অনেকেই আশঙ্কা করছেন, এই বিস্ফোরণের সময় চন্দ্রপৃষ্ঠে তাপরশ্মি বিকিরণের মাত্রা হয়তো ১০,০০০ গুণ বেড়ে যাবে। অতএব তখন চাঁদের গুহায়-গহ্বরে বা বিশেষ ধরণে নির্মিত অন্য কোনস্থানে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু প্রশ্ন, প্রয়োজন হলেই এমন কোন আশ্রয়ের ব্যবস্থা চাঁদ-যাত্রীরা করতে পারবেন কি? বিজ্ঞানীরা বলছেন, হ্যাঁ, পারবেন। বিশেষ আবরণযুক্ত আবাসগৃহ নির্মাণ করে এ সমস্যারও সমাধান করা যাবে। কিন্তু চলাফেরার কী হবে? চাঁদে হাঁটবার সময় পৃথিবীর তুলনায় অনেক

বেশি অসুবিধা হবার কথা। শুনতে ধাঁধার মতো মনে হয় যদিও, যদিও চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর ৬ ভাগের ১ ভাগ মাত্র, তবু সেখানে চলবার সময় পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশি শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এ-সমস্যারও সমাধান হতে পারে, চাঁদে গিয়ে কেউ যদি লাফিয়ে লাফিয়ে চলেন এবং যদি সেই সঙ্গে দৌড়ন। লাফিয়ে চললে এবং দৌড়লেই চাঁদের স্বল্প মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির সদ্ব্যবহার করতে পারবেন তিনি ; এবং সেই সঙ্গে তাঁর মাংসপেশীর শক্তিকেও কাজে লাগাতে পারবেন।

এদিকে বিজ্ঞানীরা বলছেন, চাঁদের এই মাধ্যাকর্ষণ বিশেষ কোন সমস্যাই নয়। আকাশ-পরিক্রমায় বেরিয়ে শূন্য-মাধ্যাকর্ষণে যে অসুবিধা ভোগ করেন অভিযাত্রীরা, তার তুলনায় পৃথিবীর ৬ ভাগের ১ ভাগ মাধ্যাকর্ষণশক্তিসম্পন্ন চাঁদে ওঁরা ঢের বেশি স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবেন। এমন কি পৃথিবীর তুলনায় অনেক আরামে ওখানে ঘুমোতে পারবেন ওঁরা। পৃথিবীর শয্যায় একজন ঘুমন্ত মানুষকে প্রতি রাত্রে প্রায় ১৫ বার নড়তে-চড়তে হয়। এই নড়াচড়া বা পাশ-ফেরার কাজটা নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই করে সে ; কিন্তু করে নিজেরই মঙ্গলের জন্যে। এরই ফলে রক্ত ঠিকভাবে সমগ্র দেহে চলাচল করার সুযোগ পায় ; দেহের কোন বিশেষ অংশ রক্ত-সঞ্চালনের আওতা থেকে বেশিক্ষণ দূরে থাকে না। কিন্তু চাঁদের দেশে ঘুমন্ত অবস্থায় এই ধরণের নড়া-চড়ার প্রয়োজন প্রায় নেই বললেই হয়। কারণ, সেখানে মাধ্যাকর্ষণ কম বলে দেহ যাতে শায়িত থাকবে, তা' থেকে চাপ সৃষ্টি হবে অপেক্ষাকৃত অল্প। ফলে ঘুমের ঘোরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে যখন-তখন নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন হবে না এবং ঘুমোন যাবে পরম নিশ্চিন্তে।

এদিকে স্পুটনিকে করে পৃথিবী-প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে আমেরিকা

এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মহাকাশচারীরা বিশেষ কয়েকটি শারীরিক প্রতিক্রিয়ার কথা জানিয়েছেন। ওঁরা বলেছেন, প্রদক্ষিণের সময় রক্তের চাপ কমে যায় ; হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন চলে ধীর তালে।

সন্দেহ নেই, মাধ্যাকর্ষণের হের-ফেরই হল এগুলোর মূল কারণ ; এবং চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণও কম বলে ওখানে যাঁরা যাবেন, রক্তের চাপ স্বভাবতই তাঁদের কমে আসবে, তাঁদের হৃৎপিণ্ডও চলবে ধীর ও মন্থর গতিতে। ফলে, অনেক কম পরিশ্রমেই হৃৎপিণ্ড দেহের রক্ত-সঞ্চালনের কাজটা বেশ সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে দেবে।

এরপর আসছে আলো-আঁধারের প্রসঙ্গ ; চাঁদে গিয়ে মানুষ দেখবে কী এবং কতটুকু, সে সব কথা। এদের জবাব দিতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বলছেন, চাঁদের দিনে ও রাত্রিতে পৃথিবীর তুলনায় বেশি আলোর সন্ধান পাওয়া যাবে। অবশ্য সেখানে গিয়ে অদ্ভুত কিছু অভিজ্ঞতা হবে মানুষের। সে দেশে বায়ু নেই বলে সবাই দেখবে, আলো ও আঁধারের পার্থক্যটা বড় বেশি প্রকট। চাঁদ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের এই অনুমান এরই মধ্যে অনেকটা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তিন জন মার্কিন নভশ্চর রোরম্যান, লোভেল ও এ্যাণ্ডার্স চাঁদ থেকে ৬০ মাইল দূরে দাঁড়িয়ে সে-দেশের আলো-আঁধারের পার্থক্য প্রত্যক্ষ করেছেন। এবং এরপর মাত্র ১০ মাইল দূর থেকে চাঁদকে প্রত্যক্ষ করেছেন স্ট্যাফোর্ড ও সারনান।

এ ছাড়া চাঁদে গিয়ে কখনও সেখানকার পাহাড়-পর্বতের দিকে তাকাবে মানুষ। কখনও আবার সে রাজ্যের বৃক্ষ-লতা ও জন-প্রাণিহীন মাঠ-ময়দানগুলোকে দেখবে। তার আবাসগৃহের ভেতর থেকে দেখবে সে। কখনও দেখবে স্পেস-স্যুটের আড়াল থেকে। ফলে, চাঁদের দেশের আলোর যথাযথ সান্নিধ্য সে হয়তো পাবে না, তার আবাসগৃহ বা স্পেস-স্যুটের স্বচ্ছ আবরণগুলো হয়তো শতকরা

১০ থেকে ১৫ ভাগ আলো শুষে নেবে অথবা প্রতিহত করবে, কিন্তু তবু পৃথিবীর তুলনায় সব কিছুকেই অনেক বেশি উজ্জ্বল দেখবে সে ; এবং সে ঔজ্জ্বল্য হবে পৃথিবীর সবচেয়ে আলোকোদ্ভাসিত দিনের চেয়েও শতকরা ২০ ভাগ বেশি।

চাঁদের দেশের রাত্রিও হবে বৈচিত্র্যময়। পৃথিবীকে সেখান থেকে স্পষ্ট চোখে পড়বে। অভিযাত্রীরা দেখবে, খানিকটা দূরেই বিরাট এক চাঁদ আলোয় আলোয় ঝলমল করছে। সে আলোর পরিমাণ কতটুকু? বিজ্ঞানীরা বলছেন, পৃথিবীর পূর্ণিমা রাত্রিতে চাঁদের কাছ থেকে যে আলো আমরা পাই, তার ঠিক ৮০ গুণ। অর্থাৎ, সে আলোতে চাঁদে বসে স্বচ্ছন্দেই পড়াশুনা করা যাবে। এমন কি পৃথিবীকে নতুন এক চাঁদ হিসেবে কল্পনা করে নিয়ে কেউ যদি কবিতা লিখতে চান তো তাতেও বাধা নেই। লিখুন যত খুশি কবিতা। অথবা লিখুন চাঁদের রিপোর্ট। কিন্তু একটি কথা, রিপোর্ট লিখতে বসে সত্যকে এড়িয়ে যাবেন না যেন। মনে রাখবেন, চাঁদে আলোর যে রঙ্ দেখবেন আপনি, তা' তা'র প্রকৃত রঙেরই খুব কাছাকাছি। কারণ পৃথিবীর মতো বায়ুমণ্ডল নেই সে দেশে ; এবং নেই বলেই আলো একদিকে যেমন সেখানে বিক্ষিপ্ত হয় না, অপরদিকে তেমনি শোষণের কবল থেকেও রক্ষা পায়।

কিন্তু এসব কিছুই হল জল্পনা-কল্পনা ; আদার ব্যাপারী হয়ে হয়ে জাহাজের খবর নেবার প্রয়াস। এদিকে ট্রেনে বসবার জায়গা পাইনে, বাসে কোন রকমে একটু ঝুলে থাকতে পারলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। ওদিকে বেহায়া সেজে খবর রাখতে যাই চাঁদের টাইম-টেবল্-এর। নির্লজ্জের মতো প্রশ্ন করি, চাঁদের গাড়ি কবে ছাড়বে? কবে স্থুরু হবে এ্যাড্ভান্স্ বুকিং? প্রশ্ন শুনে তারিফ করেন অনেকেই। কিন্তু কদাচিৎ কেউ কেউ বাধাও দেন।

বলেন, তোমার পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি লোক এখনও দু'বেলা পেট পুরে খেতে পায় না যে! বাছুড়ের মত কসরৎ দেখাতে দেখাতে এখনও যে ওরা ট্রামে-বাসে ঝুলে থাকে। এমন দিনে কোটি কোটি টাকার স্পেস-ভেহিকল্-এ চেপে চাঁদে যাবার সুখস্বপ্ন দেখতে তোমার লজ্জা করে না? সেখানে গিয়ে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত ও অসহায় মানুষের কোন্ উপকারটা করবে তুমি?

॥ তুই ॥

বাইরে বেড়াতে যাই যখন 'ট্যুরিস্ট্ প্যাম্প্লেট' না হলে তখন চলে না। এদিকে চাঁদের সম্ভাব্য ট্যুরিস্ট্রাও প্যাম্প্লেট সংগ্রহে ব্যস্ত। উপগ্রহটির কোথায় কি আছে, তা' জানবার জন্যে অনেক আগে থাকতেই ওরা বদ্ধপরিকর। কিন্তু এতকাল অজস্র চেষ্টা সত্ত্বেও সে দেশের 'ট্যুরিস্ট্ প্যাম্প্লেট'-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় নি। কারণ, দেশটির অর্ধেক অংশ পৃথিবীর দৃষ্টিপথ থেকে চিরকালের মতো অবগুণ্ঠিত ছিল। সম্প্রতি সেই অবগুণ্ঠন ঘুচে গেছে। সোভিয়েত-পরিচালিত তৃতীয় 'স্পেস রকেট' এবং তারপর আকাশযাত্রী আরও কয়েকটি রকেটের সাহায্যে চাঁদের আড়াল-করা দিকটির ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে। ফলে পাওয়া গেছে এমন সব নতুন খবর, চাঁদযাত্রীদের কাছে যেগুলোর প্রত্যেকটি মহা-মূল্যবান।

অবশ্য সন্দেহ নেই যে, চাঁদ সম্বন্ধে দুরতিক্রম্য একটা কৌতূহল আদ্যিকাল থেকেই মানব-সমাজে চালু ছিল। জ্যোৎস্না-রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে অনেকেই ভাবত, এক বুড়ি বসে বসে সুতো কাটে ওখানে। তারপর গ্যালিলিওর (১৫৬৪-১৬৪২) আমল থেকে প্রাচীন ধারণাগুলো বদলাতে লাগল। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে চাঁদের পৃষ্ঠদেশ ব্যাপকভাবে পরীক্ষার আয়োজন হল। দেখা গেল, বুড়ি থাকে না সে দেশে। সেখানকার গুহা-গহ্বর ও পর্বত-সমাকীর্ণ অঞ্চলগুলো জীবনধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। কিন্তু তবু অনেকেই প্রশ্ন তুললেন, চাঁদের একটি দিক তো আমরা দেখতে

পাই নি; সেখানে কী থাকে? বুড়ি না থাকুক, তার কোনো নাতি-নাত্‌নী অথবা জীব না থাকুক, কোনো লতাগুল্ম সেখানে থাকে কি?

গ্যালিলিওর তিরোধানের পর দেখতে দেখতে ৩০০ বছর পেরিয়ে গেল। শত-সহস্র জিজ্ঞাসু চোখ দূরবীক্ষণের ভিতর দিয়ে চাঁদের দিকে তাকাল। কিন্তু এসব প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া গেল না। এদিকে কৌতূহল বেড়ে চলল দিনের পর দিন। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা, হিসেব কষে বললেন, পৃথিবী থেকে মাত্র ৫ লক্ষ কিলোমিটার দূরে থাকে এই চাঁদ। সৌরজগতের আর কোনো প্রতিবেশী আমাদের এত কাছে নেই। এমন কি নিকটতম গ্রহ মঙ্গল বা শুক্রও এর তুলনায় শত শত গুণ বেশি দূরে। অতএব এই ঘরের-কাছের উপগ্রহটির রহস্য ভেদ করতে না পারলে ঘরের লোকদের কাছে আর মান থাকছে না।

তাই মান রাখবার খাতিরে জোরাল কৈফিয়ৎ দিলেন অনেকেই। বললেন, চাঁদ নিজে অক্ষরেখার ওপর একবার আবর্তন করতে যতটুকু সময় নেয়, একবার করে পৃথিবী-প্রদক্ষিণ করতেও সময় নেয় ঠিক ততটুকু। ফলে চাঁদের একটি পিঠ পৃথিবী থেকে কোন-কালেই দৃষ্টিগোচর হয় না। একবার পৃথিবী-পরিক্রমা করতে যে প্রায় ২৭ দিন সময় লাগে তার, সে সময়ের বিশেষ কোনো মুহূর্তেও অদৃশ্য অংশখানিকে সে আমাদের কাছে দৃশ্য করে না। ফলে এতকাল ধরে চাঁদ সম্বন্ধে আমাদের গবেষণা শুধুমাত্র তার অর্ধেকটা অংশের ওপর সীমাবদ্ধ ছিল। আমরা জেনে এসেছি, চাঁদের যে ধূসর ও কালো দাগগুলো চোখে পড়ে, ওরা হল 'সাগর'।

সাগর নামেই। আসলে জলের চিহ্নমাত্র ওখানে নেই। ওখানকার ধূসর ও কালো দাগগুলো হল পর্বত-পরিবেষ্টিত নিচু

সমতলভূমি। এ ছাড়া চাঁদের দৃশ্য-দিকটির এক বিরাট অংশ ছোট-বড় অসংখ্য পর্বতে সমাচ্ছন্ন। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, মোট ৩০,০০০টি পর্বত আছে ওখানে।

পর্বতগুলোর বৈশিষ্ট্য এই যে, ওরা এবড়ো-খেবড়ো নয় মোটেই; বরং বেশ মসৃণ ও গোলাকার। দেখতে ওরা যেন অনেকটা পৃথিবীর আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের মতো।

এ ছাড়া চাঁদে আছে বহু গিরিসংকট। এরা শত শত মিটার প্রশস্ত ও গভীর। আজ অবধি সেখানে পাঁচ শতেরও বেশি গিরিসংকটের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই সন্ধানের কাজে 'রেডিও-টেলিস-কোপ'-এর সাহায্য নিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। আর আমরাও জানতে পেরেছি চাঁদের পৃষ্ঠদেশ সম্পর্কে বহু নতুন খবর। জেনেছি, চাঁদের দেশে তাপ-বিকিরণ হয় কতটুকু; সূর্যের কাছে ধার-করা আলোকের তারতম্য-হেতু সেই বিকিরণের কতটুকু হ্রাস-বৃদ্ধি হয়; এবং এর চেয়েও বড় কথা, আমরা জেনেছি, চাঁদের পৃষ্টে তাপাংক কখন কতদূর ওঠে।

চাঁদের তাপ-বিকিরণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, পৃষ্ঠদেশ থেকে বিকিরণ সুরু হয় না তার; সুরু হয় অপেক্ষাকৃত গভীর কয়েকটি স্তর থেকে।

অবশ্য চাঁদের সম্ভাব্য অভিযাত্রীরা এই সব খবর পেয়ে মোটেই উল্লসিত নন। ওঁরা বলছেন, এই খবরগুলোকে চাঁদের ট্যুরিস্ট্ প্যাম্প্লেট-এর প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে জুড়ে দিও তোমরা। আর আমাদের দিও দ্বিতীয় খণ্ডের খবর; চাঁদের অপর পিঠে কি আছে, সম্ভব হলে তা আমাদের জানিয়ে দিও। কারণ, উপগ্রহটিতে ভ্রমণের সময় সে খবরগুলোই বেশি কাজে লাগবে।

বিজ্ঞানীরা এবার উঠে-পড়ে লাগলেন। কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠালেন চাঁদের আড়াল-করা পিঠের ছবি তোলা হবে বলে। ছবি উঠলও। সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় চাঁদ-বরাবর উৎক্ষিপ্ত হল স্পেস রকেট। 'ইণ্টারপ্ল্যানেটারি স্টেশান' স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে চাঁদের অবগুণ্ঠিত দিকটির ছবি তুলল। এই সব ছবি বিশ্লেষণ করে আমাদের চিরপরিচিত উপগ্রহটির উদ্ভব, আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জানা গেল অনেক নতুন তথ্য।

এর আগে চাঁদের আড়াল-করা দিকটি সম্বন্ধে বহু আজগুবি কল্পনা অনেকের মনেই উঁকি দিত। অনেকেই বলতেন, জল আছে সেখানে; বায়ু আছে; এবং এমন কি জীবনও আছে। অনেকে আবার বলতেন, চাঁদ দেখতে অনেকটা নাশপাতির মতো। পৃথিবীর বিপরীত দিকে তার যে অংশটি আছে, তা' সামনের দিকে কিছুটা সম্প্রসারিত।

স্বয়ংক্রিয় 'স্পেস-রকেট' ও 'ইণ্টার-প্ল্যানেটারী স্টেশান' থেকে তোলা ছবিগুলোর সাহায্যে এইসব ভুল ধারণা দূর হল। জানা গেল, চাঁদের আড়াল-করা দিকটি আকারে-প্রকারে অনেকটা দৃশ্য দিকটিরই অনুরূপ। অভাবনীয় কিছু নেই সেখানে। অত্যাশ্চর্য এমন কিছু নেই, যা' আজগুবি সিদ্ধান্তকারদের উৎসাহিত করতে পারে। তবে অদৃশ্য দিকটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, দৃশ্য দিকটির তুলনায় সেখানে গুহা-গহ্বরের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর একটিমাত্র যে পর্বতশ্রেণী সেখানে রয়েছে, দৈর্ঘ্যে তা' ২,০০০ কিলোমিটার। আর সেখানকার সবচেয়ে বড় গহ্বরটির ব্যাস হল ৩০০ কিলোমিটার। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এই গহ্বরটির নাম দিয়েছেন 'মস্কো সী'। এ ছাড়া সেখানকার অন্যান্য গহ্বরগুলোর অধিকাংশেরই নামকরণ করা হয়েছে শ্রেষ্ঠ মনীষীদের

সমতলভূমি। এ ছাড়া চাঁদের দৃশ্য-দিকটির এক বিরাট অংশ ছোট-বড় অসংখ্য পর্বতে সমাচ্ছন্ন। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, মোট ৩০,০০০টি পর্বত আছে ওখানে।

পর্বতগুলোর বৈশিষ্ট্য এই যে, ওরা এবড়ো-খেবড়ো নয় মোটেই; বরং বেশ মসৃণ ও গোলাকার। দেখতে ওরা যেন অনেকটা পৃথিবীর আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের মতো।

এ ছাড়া চাঁদে আছে বহু গিরিসংকট। এরা শত শত মিটার প্রশস্ত ও গভীর। আজ অবধি সেখানে পাঁচ শতেরও বেশি গিরিসংকটের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই সন্ধানের কাজে 'রেডিও-টেলিস-কোপ'-এর সাহায্য নিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। আর আমরাও জানতে পেরেছি চাঁদের পৃষ্ঠদেশ সম্পর্কে বহু নতুন খবর। জেনেছি, চাঁদের দেশে তাপ-বিকিরণ হয় কতটুকু; সূর্যের কাছে ধার-করা আলোকের তারতম্য-হেতু সেই বিকিরণের কতটুকু হ্রাস-বৃদ্ধি হয়; এবং এর চেয়েও বড় কথা, আমরা জেনেছি, চাঁদের পৃষ্টে তাপাংক কখন কতদূর ওঠে।

চাঁদের তাপ-বিকিরণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, পৃষ্ঠদেশ থেকে বিকিরণ স্রুরু হয় না তার; স্রুরু হয় অপেক্ষাকৃত গভীর কয়েকটি স্তর থেকে।

অবশ্য চাঁদের সম্ভাব্য অভিযাত্রীরা এই সব খবর পেয়ে মোটেই উল্লসিত নন। ওঁরা বলছেন, এই খবরগুলোকে চাঁদের ট্যুরিস্ট্ প্যাম্প্লেট-এর প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে জুড়ে দিও তোমরা। আর আমাদের দিও দ্বিতীয় খণ্ডের খবর; চাঁদের অপর পিঠে কি আছে, সম্ভব হলে তা আমাদের জানিয়ে দিও। কারণ, উপগ্রহটিতে ভ্রমণের সময় সে খবরগুলোই বেশি কাজে লাগবে।

বিজ্ঞানীরা এবার উঠে-পড়ে লাগলেন। কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠালেন চাঁদের আড়াল-করা পিঠের ছবি তোলা হবে বলে। ছবি উঠলও। সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় চাঁদ-বরাবর উৎক্ষিপ্ত হল স্পেস রকেট। 'ইণ্টারপ্ল্যানেটারি স্টেশান' স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে চাঁদের অবগুণ্ঠিত দিকটির ছবি তুলল। এই সব ছবি বিশ্লেষণ করে আমাদের চিরপরিচিত উপগ্রহটির উদ্ভব, আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জানা গেল অনেক নতুন তথ্য।

এর আগে চাঁদের আড়াল-করা দিকটি সম্বন্ধে বহু আজগুবি কল্পনা অনেকের মনেই উঁকি দিত। অনেকেই বলতেন, জল আছে সেখানে; বায়ু আছে; এবং এমন কি জীবনও আছে। অনেকে আবার বলতেন, চাঁদ দেখতে অনেকটা নাশপাতির মতো। পৃথিবীর বিপরীত দিকে তার যে অংশটি আছে, তা' সামনের দিকে কিছুটা সম্প্রসারিত।

স্বয়ংক্রিয় 'স্পেস-রকেট' ও 'ইণ্টার-প্ল্যানেটারী স্টেশান' থেকে তোলা ছবিগুলোর সাহায্যে এইসব ভুল ধারণা দূর হল। জানা গেল, চাঁদের আড়াল-করা দিকটি আকারে-প্রকারে অনেকটা দৃশ্য দিকটিরই অনুরূপ। অভাবনীয় কিছু নেই সেখানে। অত্যাশ্চর্য এমন কিছু নেই, যা' আজগুবি সিদ্ধান্তকারদের উৎসাহিত করতে পারে। তবে অদৃশ্য দিকটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, দৃশ্য দিকটির তুলনায় সেখানে গুহা-গহ্বরের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর একটিমাত্র যে পর্বতশ্রেণী সেখানে রয়েছে, দৈর্ঘ্যে তা' ২,০০০ কিলোমিটার। আর সেখানকার সবচেয়ে বড় গহ্বরটির ব্যাস হল ৩০০ কিলোমিটার। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এই গহ্বরটির নাম দিয়েছেন 'মস্কো সী'। এ ছাড়া সেখানকার অন্যান্য গহ্বরগুলোর অধিকাংশেরই নামকরণ করা হয়েছে শ্রেষ্ঠ মনীষীদের

নামে। মনীষীদের মধ্যে মেণ্ডেলিভ, টিসিয়লভস্কি ও জোলিও কুরীর মতো বিজ্ঞানীরা যেমন রয়েছেন, তেমনি আবার রয়েছেন জুলে-ভার্ণের মতো রহস্য-কাহিনীকার।

তবে মনীষীদের কথা থাক এখন। এখন বরং ফিরে আসা যাক চাঁদের অদৃশ্য দিকের ছবিগুলোর প্রসঙ্গে। ছবিগুলো বিশ্লেষণ করে সামান্য কম-বেশি প্রতিফলন-শক্তিবিশিষ্ট কতকগুলো অঞ্চলের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। আর দেখা গেল, সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে চাঁদের যে দিকটি, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তার ছবি তোলা সম্ভব হয় নি। কারণ, ছায়ার অস্তিত্ব সে রাজ্যে নেই বললেই চলে। তাই এখন চেষ্টা চলছে অনুকূল আলোক-ব্যবস্থার মধ্যে আরও ভাল ছবি তোলবার।

সন্দেহ নেই, এ চেষ্টা ভবিষ্যতে আরও সাফল্যমণ্ডিত হবে ; এবং তখন চাঁদের উদ্ভব ও বিবর্তন সম্বন্ধে যেমন, তার গহ্বরগুলোর সৃষ্টি-রহস্য সম্বন্ধেও তেমনি অনেক অজানা তথ্য আবিষ্কৃত হবে।

চাঁদের গহ্বর নিয়ে বিচিত্র সব ধারণা কিছুদিন আগেও চালু ছিল। অনেকেই বিশ্বাস করতেন, বড় বড় সব উল্কাখণ্ডের সঙ্গে চাঁদের সংঘর্ষের ফলেই ওগুলো সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা আজকের বিজ্ঞানীদের অনেকেই মেনে নিতে নারাজ। কারণ, উল্কাখণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে যদি ঐ গহ্বরগুলোর সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে বলতে হয়, উল্কারা নিশ্চয়ই বিভিন্ন কোণ থেকে এসে চাঁদকে আঘাত করেছে ; এবং তবে আঘাতের ফলে সৃষ্ট গহ্বর-গুলোও উপবৃত্তাকার হ'ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, প্রায় সবগুলো গহ্বরই বৃত্তাকার। দ্বিতীয়ত এমন কথা মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই যে, অতিকায় সব উল্কাপিণ্ড চাঁদের পিঠে এসে অনাদিকাল ধরে আছড়ে পড়েছে। অপরদিকে অতি

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে, চাঁদের একটি গহ্বর থেকে উষ্ণ বাষ্প বেরিয়ে আসছে। এ থেকে অনেকেই অনুমান করছেন, আগ্নেয়গিরি-সঞ্জাত উপাদান থেকেই চাঁদের সৃষ্টি। এ ছাড়া পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, বৃত্তাকার গহ্বরের সৃষ্টি এবং উষ্ণ বাষ্পের নিঃসরণ শুধুমাত্র অবক্ষয়মাণ কিছু খনিজ পদার্থের অবস্থিতির ফলেই সম্ভব হতে পারে।

তবে এখনও অবধি এ সম্বন্ধে স্থির কোনো সিদ্ধান্তে বিজ্ঞানীরা পৌঁছন নি। সিদ্ধান্ত যেদিন সর্ববাদিসম্মত হবে, সেদিন হয়তো চাঁদের আড়াল-করা দিকটি সম্বন্ধে আরও অনেক নতুন তথ্য জানা যাবে। গ্রহান্তরের সম্ভাব্য অভিযাত্রীরাও চাঁদের দ্বিতীয় খণ্ড—ট্যুরিস্ট্ প্যাম্প্লেট্টির প্রথম সংস্করণ বগলদাবা করে আনন্দে-উল্লাসে ও বিস্ময়ে-রোমাঞ্চে ক্ষণে ক্ষণে অভিভূত হবার সুযোগ লাভ করবেন।

॥ তিন ॥

এদিকে কিছুদিন থেকেই চাঁদের দেশ সম্পর্কে রহস্যময় সব সংবাদ কানে আসছে আমাদের। আমরা ভেবে পাচ্ছি না, সংবাদগুলো পাঠ করে অবিশ্বাসের হাসি হাসবো, না কি বিশ্বাস করে দুশ্চিন্তার বোঝাকে আরও বাড়াবো। তবে সব দিক মিলিয়ে দেখে মনে হচ্ছে, চাঁদের রাজ্যকে কেন্দ্র করে এখনও কয়েক হাজার আরব্য-উপন্যাস রচিত হতে পারে; এবং এই শ্রেণীর উপন্যাস যদি রচিত হয়, তবে তার প্রথমেই উল্লেখ করতে হবে ডঃ কার্ল-স্যাগান-এর নাম।

ডঃ স্যাগান হলেন গ্রহান্তরে জীবের অস্তিত্ব নিয়ে গবেষণা-রত একজন বিশ্রুত বিজ্ঞানী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবিভাগকে অন্য সব গ্রহমণ্ডলের বা উপগ্রহলোকের জীবন সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে থাকেন তিনি।

তিনি ১৯৬২ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লস্ এন্‌জেলস্-এ অনুষ্ঠিত আমেরিকার রকেট সোসাইটির এক সভায় চাঞ্চল্যকর কিছু তথ্য পরিবেশন করলেন। তিনি বললেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্য কোনো গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীরা এরই মধ্যে হয়তো পৃথিবী-পরিদর্শন করেছে। হয়ত এরই মধ্যে ওরা ঘাঁটি স্থাপন করেছে, চাঁদের আড়াল-করা দিকটিতে।

কথাটা কতখানি বিশ্বাসযোগ্য, তা' জানি নে। তবে অকুণ্ঠিত-চিত্তে বলতে পারি, এক সময়ে 'রেঞ্জার সিরিজ'-কে কেন্দ্র করে চাঁদের রহস্য বেশ দানা বেঁধে উঠেছিল। অনেকেই লক্ষ্য করেন

তখন যে, 'রেঞ্জার সিরিজ'-এর পরীক্ষা চলবার সময় পর পর ছয়টি রকেট চাঁদের পৃষ্ঠদেশকে আঘাত করল, কিন্তু পৃথিবীর উদ্দেশে ওরা একটিও ছবি পাঠাল না।

এদিকে চাঁদকে লক্ষ্য করে সপ্তম রকেটটি উৎক্ষিপ্ত হল ১৯৬৪ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে। এই রকেটটি বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো কাজ করল। চাঁদের দেশ থেকে পৃথিবীর অভিমুখে ছবি পাঠাল মোট ৪,৩২০টি। এই ছবিগুলোর একটিতে চাঁদের কোনো গহ্বরের মধ্যে দুটি বৃহদাকার সাদা পদার্থ দেখা গেল।

এই সাদা পদার্থগুলোকে নিয়ে গবেষণা চলল পুরোদমে; এবং শেষ অবধি স্থির হল, এরা অদ্ভুত বা অভাবনীয় কিছু নয়; চাঁদের দেশের পাহাড়-পর্বতেরই অংশ-বিশেষ।

এই ঘটনার কয়েক মাস পর উৎক্ষিপ্ত হল 'রেঞ্জার সিরিজ'-এর অষ্টম রকেট। এই রকেটটি চাঁদের দেশের মোট ৭০০০টি ছবি উপহার দিল পৃথিবীকে। কিন্তু পৃথিবীর কিছু সংখ্যক অতি-সাবধানী মানুষ ছবিগুলোর অধিকাংশই অপ্রকাশিত রাখলেন। মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকটি ছবিকে জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শন করলেন ওঁরা।

কিন্তু কেন করলেন? ফ্রাঙ্ক এড্‌ওয়ার্ড্‌স্ প্রশ্ন তুলেছেন, কেন প্রায় সবগুলো ছবিকেই চেপে রাখা হল? তবে কি চাঁদের দেশের বিস্ময়কর সব সংবাদ সেখানে ছিল? সে দেশের অজানা অনেক তথ্য সেখানে ধরা পড়েছিল বড় বেশি স্পষ্টভাবে?

জানি নে এসব কিছুর উত্তর। তবে চাঁদের যে-সব ছবি সাধারণ মানুষ দেখতে পেয়েছে, তাদের মধ্যেও রহস্য বড় কম নেই।

চাঁদের পিঠের সবচেয়ে রহস্যময় বস্তু হল কিছু সংখ্যক 'গম্বুজ'। দেখতে ওরা সাদা এবং অর্ধবৃত্তাকার। এই শ্রেণীর গম্বুজের অস্তিত্ব প্রথম ধরা পড়ে ১৯৩০ খৃস্টাব্দে। তারপর ১৯৬০ খৃস্টাব্দের মধ্যেই

চাঁদের দেশে ঠিক এইরকম আরও ২০০টি গম্বুজাকৃতি বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। ওদের প্রত্যেকেরই রঙ্ সাদা এবং আকৃতি অর্ধ-বৃত্তাকার। বিজ্ঞানীরা ওদের পর্যবেক্ষণ করে বললেন, আর যা-ই হোক না কেন, ওরা অন্তত পাহাড়-পর্বত নয়। কারণ, চাঁদের মতো বায়ুহীন ও গোলাকার কোনো বস্তুর পৃষ্ঠদেশে পাহাড়-পর্বত ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্য হয়েই আবার অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না। এদিকে ঐ গম্বুজাকৃতি বস্তুগুলোর ছায়া পরীক্ষা করলে মনে হয়, ওরা গোলাকার; এবং এমন সব স্থানে ওরা আছে যাদের দেখতে প্রায় মসৃণ এবং সমতল।

বিজ্ঞানীদের অনুমান, গম্বুজগুলোর এক-একটির ব্যাস ৬০০ ফুটের কাছাকাছি। অর্থাৎ, আমাদের পৃথিবীতে শঙ্কু আকারের যে আগ্নেয়গিরি রয়েছে, তাদের তুলনায় এরা ছোট। তবে বিস্ময়ের কথা এই যে, গম্বুজগুলো নিশ্চল হয়ে নেই। কখনও বিশেষ এক-একটি জায়গায়, কখনও আবার অন্যত্র চোখে পড়ে ওদের।

স্থান-পরিবর্তনশীল এই সব গম্বুজকে দেখে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছিলেন, তবে কি চাঁদে জীবন আছে? না কি অন্য কোনো গ্রহের অভিযাত্রীরা ঘাঁটি স্থাপন করেছে ওখানে?

এদিকে বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাকে কেন্দ্র করে চাঁদ সম্বন্ধে নানারূপ কৌতূহলোদ্দীপক মতবাদ গড়ে উঠেছে। ১৯৫৮ খৃস্টাব্দে সোভিয়েট জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোজিরেভ্ এই ধরণের একটি মতবাদের গোড়াপত্তন করেন। তিনি জানান, চাঁদের একটি আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ অ্যারিস্টারকাস্ থেকে অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই অগ্ন্যুৎপাতের কথা প্রথমে অবগত হন তিনি এবং তারপর তাঁর প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন বর্ণালী-বিশ্লেষণের সাহায্যে। ১৯৬৩ খৃস্টাব্দে চারজন বিখ্যাত

মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর পরীক্ষা থেকে কোজিরেভ্-এর গবেষণা অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। এ ছাড়া ঐ বছরেই ২৯শে অক্টোবর 'লোয়েল অব্জারভেটরী' থেকে সংবাদ পাওয়া যায় যে, ওখানকার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হিরোদতাস্ নামক আগ্নেয়-জ্বালামুখের উত্তরদিকে উজ্জ্বল লাল আলোকের সন্ধান পেয়েছেন। ২৭শে নভেম্বর ওঁরা জানালেন, পূর্ববর্তী স্থানগুলো থেকে এই লাল আলো অদৃশ্য হয়েছে এবং দৃশ্য হয়েছে অন্য একটি জায়গা অ্যারিস্টারকাস্ থেকে।

১৯৬৫ খৃস্টাব্দে চাঁদের দেশের ঐ রহস্যময় আলোক সম্পর্কে আরও অনেক নতুন খবর পাওয়া গেল। একজন শৌখিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী জানালেন, অ্যারিস্টারকাস্ থেকে অদ্ভুত ধরণের একপ্রকার উজ্জ্বল সাদা আলোক বেরিয়ে আসতে তিনি দেখেছেন। বিজ্ঞানীটিকে ধন্যবাদ; ক্যালিফোর্নিয়া এবং এরিজোনার বিজ্ঞানী-দেরও যথাসময়ে তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তাই আরও অনেকেই দেখলেন সেই আলোক। দেখলেন, সাদা আলোর একটি স্পষ্ট রেখা এক-একবার করে আবির্ভূত হচ্ছে; এবং থাকছে প্রতি-বারেই প্রায় দেড় সেকেণ্ড করে।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা এই রহস্যময় পদার্থকে দেখেছেন, তাঁদের প্রায় সকলেরই ধারণা, এ কোনো নক্ষত্রালোকের প্রতিফলন নয়, এমন কি প্রতিফলিত সূর্যরশ্মিও নয় এ।

এদিকে চাঁদের দেশের রহস্যময় আলোক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের খবর সরবরাহ করলেন নিউ মেক্সিকোর এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী রবার্ট. ই. কার্টিস্। ১৯৫৬ খৃস্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর ৩৫ মিলিমিটার মুভি ক্যামেরা দিয়ে চাঁদের ছবি তুলছিলেন তিনি। ছবি তুলবার সময় উদ্যোগ-আয়োজনের কোনো ত্রুটি ছিল না। ১৬ ইঞ্চি

ব্যাসযুক্ত 'রিফ্লেকটার টেলিসকোপ্'ও তাঁর সঙ্গেই ছিল। তা ছাড়া মিঃ কার্টিস্ ছিলেন একজন পাকা ফটোগ্রাফার।

কিন্তু ফটো তুলে শেষ অবধি বিস্ময়ে হতবাক হলেন তিনি। দেখলেন, চাঁদের সূর্যালোকিত এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশের ঠিক সীমারেখার মধ্যে ক্রশ-চিহ্নের মতো কী যেন একটা সাদা পদার্থ। পদার্থটি থেকে সাদা আলোক ঠিকরে বেরোচ্ছে এবং বেশ বোঝা যাচ্ছে, হয় চাঁদের ঠিক পিঠে আছে এই আলোক ; আর নয়তো আছে সে অঞ্চলের খুবই কাছে।

এই খবর শুনে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ওয়াল্টার হ্যাজ বললেন, চারটি সমান বাহুবিশিষ্ট এই যে ক্রশচিহ্ন, এ হয়তো ছুটি পর্বত-শিরার প্রতিমূর্তি ; পর্বতগুলোর নিম্নবর্তী অঞ্চলে যখন সূর্যকিরণ পড়ে শুধুমাত্র তখনই ওদের দেখা যায়।

এদিকে ওয়াল্টার হ্যাজ-এর এই অনুমানকে অনেকেই মেনে নিলেন না। অনেককেই বলতে শোনা গেল, ছুটি পর্বত-শিরার একে অপরকে একেবারে সমকোণে দ্বিখণ্ডিত করবে, কোনোমতেই একথা মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মানুসারে এটা অসম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-বিজ্ঞানীরাও এই মতে সায় দিলেন।

কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে গেল, এ ক্রশচিহ্ন আসলে কী ? এ কি চাঁদে যাবেন যাঁরা তাঁদের সুখস্বপ্নকে ধ্বংস করার জন্যে কোনো বস্তু ? আমাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে অসামান্য হয়ে উঠেছে ?

॥ চার ॥

দেখতে দেখতে চাঁদে অভিযানকে ঘিরে আরও অনেক রকম অসামান্য ভাবনা পল্লবিত হয়ে উঠছে। এইসব ভাবনার মূলে মানুষের আদিম প্রবৃত্তি।

'প্যাপিরাস'-এর যুগ থেকে আজ অবধি কালের ব্যবধান প্রায় চার হাজার বছর। এর মধ্যে সমাজ ও সভ্যতার আদল বদলেছে অনেকখানি। কিন্তু মানুষের আদিম প্রবৃত্তি প্রায় কিছুই বদলায় নি। আজও মানুষ আকাশ-পথ ধরে ছুটে-চলা উল্কার দিকে তাকিয়ে ভাবে, আগুনের গোলক ওরা। স্বর্গলোক থেকে দেবতারা ওদের পাঠিয়েছেন।

উল্কা নিয়ে চাঁদ-অভিযাত্রীদেরও ভাবনার অন্ত নেই। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে প্রায়ই বলেন ওঁরা যে উল্কা হল মহাকাশ-পরিক্রমার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। মহাশূন্যের যত্রতত্র ওদের অবারিত পদসঞ্চার। রাক্ষুসে গতিতে ভূলোকের দিকে ওরা এগোয়। ওদের সর্বনাশা স্পর্শে চন্দ্রযান ভেঙে-তুমড়ে, জ্বলে-পুড়ে, ছাই হয়ে যেতে পারে।

উল্কা সম্বন্ধে এই ভয় গ্রহান্তর অভিযাত্রীদের মধ্যে ক্রমেই সংক্রামক রোগের মত ছড়িয়ে পড়ছে; এবং বলা বাহুল্য, এই ভয় অযথা নয়। কারণ মেঘমুক্ত আকাশে অনেক সময় খালি চোখেও উল্কার দেখা মেলে। প্রায়ই দেখা যায়, দূরের আকাশে কী যেন জ্বলে উঠল হঠাৎ; এবং তারপরেই দুরন্ত বেগে চলতে শুরু করল।

এই চলন দেখে আজকের দিনের অভিযাত্রীরা যেমন, অতীতের মানুষরাও তেমনি আঁৎকে উঠত। অনেককেই বলতে শোনা যেত, 'খসে-পড়া তারা' ওরা।

আসলে তা' কিন্তু নয়। দূর-আকাশের তারা বা সূর্যের সঙ্গে উল্কার আদৌ কোন সাদৃশ্য নেই। উল্কা হল একপ্রকার মহাজাগতিক বস্তু, ঊর্ধ্বস্তরের ব্যয়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে এসে যারা জ্বলে ওঠে। সাধারণত ৮০ থেকে ১২০ কিলোমিটার উঁচুতে জ্বলে ওরা। তবে অনেক সময় আবার দেখা যায়, বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৃথিবীর আরও খানিকটা কাছে নেমে এসেছে উল্কার দল। এমন কি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫০ বা ৫৫ কিলোমিটার অবধি দূরে নেমে এসেছে।

কদাচিৎ কোন কোন উল্কা পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়; ভূপৃষ্ঠকে আঘাত করে সেকেণ্ডে ১০ থেকে ৭০ কিলোমিটার গতিবেগে।

বিস্ময়ের কথা, এই উল্কা-জাতীয় পদার্থ সূর্যকে চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। নানা জাতের উল্কা আছে আমাদের এই সৌর-জগতে। অতিকায় আকারের আছে; আবার আছে ছোট্ট ধূলিকণা-সদৃশ। এই উল্কাপুঞ্জের ভিতর দিয়েই আমাদের পৃথিবী লক্ষ কোটি বছর ধরে সূর্য-প্রদক্ষিণ করছে। এ ছাড়া ঊর্ধ্বাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ বা রকেট উৎক্ষিপ্ত হয় যখন, তখন ওরা এই একই উল্কা-রাজ্যের ভিতর দিয়ে পথ চলে।

অবশ্য, সন্দেহ নেই, উল্কারাজ্যের ভিতর দিয়ে আমরা সকলেই পথ চলছি। তবে আমাদের উপর উল্কার আক্রমণটা মারাত্মক হয় না। কারণ, বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে আসবার সময় অধিকাংশ উল্কাই জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু বায়ুর অপেক্ষাকৃত ঊর্ধ্বস্তর 'স্ট্র্যাটোসফিয়ার'-এ এমনটি হবার জো নেই। কারণ বায়ু সেখানে

হাল্কা ; আর উল্কাও প্রবল-পরাক্রান্ত। তাই সেখানে উল্কার সঙ্গে স্পুটনিক বা রকেটের সংঘর্ষ বাধলে বিপদ ঘটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এদিকে মুশকিল হল, এই 'স্ট্র্যাটোসফিয়ার'-কে বাদ দিয়ে গ্রহান্তরের কোন জায়গাতেই অভিযান চালানো যাবে না। চাঁদে বা মঙ্গলগ্রহে যেখানেই আমরা যাই না কেন, 'স্ট্র্যাটোসফিয়ার'-কে অতিক্রম আমাদের করতেই হবে। কিন্তু আতঙ্কের বিষয় এই যে, সেখানে এবং তার উর্ধ্বলোকে উল্কার স্বর্গরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রচণ্ড গতিতে চলে বলে অনেক সময় এমন কি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উল্কাও গ্রহান্তরের অভিযাত্রীদের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে ; স্পেস-শিপ ফুটো করতে পারে ওরা ; রকেটে ফাটল ধরাতে পারে। উল্কার প্রচণ্ড আঘাতে গ্রহান্তরগামী যন্ত্রযান সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র উল্কাপিণ্ডদের দিয়েই ক্ষতি হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। কারণ বড় বড় উল্কার তুলনায় আকাশে ওদেরই সংখ্যাধিক্য। গত কয়েক বছরের মধ্যে যে সব স্পুটনিক ও রকেট উৎক্ষিপ্ত হয়েছে, তাদের থেকে উল্কারহস্য সম্বন্ধে অনেক কিছু নতুন খবর জানা যায়। দেখা যায় যে, রকেটের ধাতব বহিরাবরণের গায়ে উল্কাজাত ধূলিরাশি লেগে আছে। এ ছাড়া ছোট ছোট উল্কাখণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষে রকেট যে কোথাও কোথাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তারও সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই ক্ষতিকে বলা যেতে পারে উল্কাজনিত ক্ষয়। আমাদের পৃথিবীতে জল ও বায়ুর প্রভাবে ক্ষয়িষ্ণু শিলাস্তূপগুলো এর সঙ্গে তুলনীয়। তবে শিলার ধীর ও মন্থর ক্ষয়ীভবনের সঙ্গে উল্কাজনিত ক্ষয়-ক্ষতির বিরাট পার্থক্য আছে। কারণ, উল্কা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, যখন এসে রকেটকে আঘাত করে, তখন ছোটখাটো একটা বিস্ফোরণ হতে বাধ্য। এই

বিস্ফোরণ কতখানি প্রচণ্ড হবে, তা' নির্ভর করে উল্কার আকৃতি ও গতিবেগের উপর।

অতএব দেখছি, উল্কা থেকে গ্রহান্তরের যাত্রীদের বিপদ এলেও আসতে পারে। তবে সে বিপদের চেহারাটা কী ধরণের হবে তা এখনও অবধি সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নি। নির্ণয়ের চেষ্টা চলছে। প্রথম স্পুটনিক উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল ১৯৫৭ খৃস্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর ঃ সেই থেকে চলছে এই চেষ্টা। পৃথিবী থেকে ১০০ কিলোমিটার বা তারও বেশি উঁচুতে উঠে যে সব রকেট, উল্কা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে তাদের কাজে লাগানো হয়েছে। ব্যবস্থা করা হয়েছে এমনভাবে যাতে উল্কাপিণ্ড রকেট বা স্পুটনিককে আঘাত করা মাত্রই বিদ্যুৎতরঙ্গ-মারফৎ সংবাদ এসে পৃথিবীতে পৌঁছয়। অর্থাৎ, যাতে উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষের খবরটা বেতার সঙ্কেতের আকারে পৃথিবীর ঘরে বসেই পাওয়া,যায়। সুখের কথা, খবর এরই মধ্যে অনেক জড়ো হয়েছে। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর মহাশূন্যে প্রেরিত সোভিয়েট রকেট মারফৎ জানা গেছে, ১২৫ থেকে ২৫০ কিলোমিটার উঁচুতেই মহাকাশযানের সঙ্গে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উল্কাখণ্ডের বেশি সংঘর্ষ বাধে। কিন্তু রকেট যখন থাকে ৩০০ কিলোমিটারের চেয়েও বেশি উঁচুতে তখন সংঘর্ষের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অল্প। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, ১২৫ থেকে ২৫০ কিলোমিটার উঁচুতে থাকবার সময় রকেটটিকে উল্কার আঘাত সইতে হয়েছে মোট ৪৪ বার ; কিন্তু ৩০০ কিলোমিটার-এর পর ঠিক এই একই পরিমাণ সময়ে আঘাতের সংখ্যা কমে এসে মাত্র ৯-এ দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু এই তো গেল উল্কাখণ্ডের সঙ্গে মহাকাশযানের সংঘর্ষের কথা। এ ছাড়া উল্কাসৃষ্ট ধূলিকণার কথাও গ্রহান্তরের যাত্রীদের

কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ঊর্ধ্বাকাশে আছে এই ধূলিকণা। এরা ধীরে ধীরে পৃথিবীর দিকে নেমে আসে, ঘোলাজল-ভরা কোন পাত্রে ধূলি, বালি এবং ময়লা পাত্রটির তলদেশের দিকে নেমে আসার মতো।

এদিকে কৃত্রিম উপগ্রহ বা রকেটের উপর উল্কাজাত এইসব ধূলিকণার প্রভাব কী ধরণের হতে পারে, তা' নিয়ে গবেষণা চলছে। সোভিয়েট রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছেন। তবে গবেষণার ফলাফল দু' দেশের বেলায় দু' রকম দাঁড়িয়েছে। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা স্পুটনিকের প্রতি বর্গমিটার জায়গা জুড়ে যে পরিমাণ ধূলিকণার সন্ধান পেয়েছেন আমেরিকার বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন তার এক-দশমাংশেরও কম। আবার আমেরিকার বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্তও সব সময় একরকমের হয় নি। কখনও বেশি পরিমাণ উল্কাকণিকার সন্ধান পেয়েছেন ওঁরা। কখনও আবার ওরা দেখেছেন, স্পুটনিক বা রকেটের গায়ে উল্কার যে পরিমাণ ভস্মাবশেষ লেগে আছে, তা' খুবই সামান্য।

বিজ্ঞানীরা অবশ্য বলছেন, উল্কাকণিকার এই ধরণের হের-ফের অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ, পৃথিবী মহাকাশের যে পথ ধরে সূর্য-প্রদক্ষিণ করছে, তার বিভিন্ন জায়গায় উল্কার ঘনত্ব বিভিন্ন রকম। অতএব, উল্কার পরিমাণ ও প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কোনপ্রকার স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে গেলে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বার বার পর্যবেক্ষণ চালানো দরকার।

এদিকে কৃত্রিম উপগ্রহের পৃথিবী-প্রদক্ষিণকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানীরা এরই মধ্যে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। সিদ্ধান্তটি হল এই যে, উল্কা থেকে গ্রহান্তরের অভিযাত্রীদের বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা অল্প। বিজ্ঞানীদের এই মতবাদের পেছনে কয়েকটি যুক্তি আছে।

ওঁরা বলছেন, প্রথমে রাশিয়ার এবং পরে আমেরিকার উদ্যোগে উৎক্ষিপ্ত কয়েকটি করে কৃত্রিম উপগ্রহ কয়েক মাস ধরে পৃথিবী-প্রদক্ষিণ করেছে। স্পুটনিক ঐ সব সময়ে এমন কোন কোন অঞ্চল দিয়ে গেছে যেখানে উল্কার রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত; সেখানে ঝাঁক বেঁধে উল্কা-কণিকারা মহাকাশ-পরিক্রমা করে। অথচ বিশেষ বিশেষ সেই সব অঞ্চল দিয়ে যাবার সময়ও কোন কৃত্রিম উপগ্রহেরই এমন কোন ক্ষতি হয়নি যার ফলে সে তার কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে নতুন কোন পথ ধরে পৃথিবী-প্রদক্ষিণ শুরু করতে পারে। অর্থাৎ, একটি উপগ্রহও বড় কোন উল্কাখণ্ডের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয় নি। এ থেকে মনে হয়, চাঁদে যাবেন যাঁরা অথবা যাঁরা যাবেন মঙ্গল বা শুক্রগ্রহে উল্কার আক্রমণের ভয়ে তাঁদের খুব একটা ভীত হবার কারণ নেই।

এদিকে উল্কার সংঘাত থেকে মহাকাশযানকে রক্ষা করবার বিচিত্র সব আয়োজন চলছে। বিশেষ ধরণের ধাতব যৌগিক দিয়ে রকেটের বহির্ভাগকে মুড়ে দেওয়া হচ্ছে। স্থির হয়েছে, গ্রহান্তরের উদ্দেশে রকেট ছাড়া হবে এমন একটি বিশেষ সময়ে যখন উল্কা থেকে বিপদের সম্ভাবনা থাকবে অত্যন্ত অল্প। আবার যদি দেখা যায়, রকেটের চলার পথে উল্কার আবির্ভাব আকস্মিকভাবে ঘটলেও ঘটতে পারে, তবে এমন কি পূর্ব-নির্দিষ্ট মহাকাশ-পরিক্রমার সময়-সূচী পরিবর্তন করা হবে। অর্থাৎ, আয়োজনটা হবে বিমান-বিভাগের মত। 'ট্রপোসফিয়ার'-এর আবহাওয়া খারাপ থাকলে যেমন বিমান-চলাচল সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে, এ-ও হবে ঠিক তেমনি।

অতএব দেখছি, কোন দিক দিয়েই চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই, চাঁদে যাবার আয়োজনটা বেশ ঘটা করেই হচ্ছে।

চাঁদ অভিযানের ঘনঘটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করতে মন চায়, টিকিট কাটলেন? চাঁদের টিকিট? যদি না কেটে থাকেন তো উঠেপড়ে লাগুন এইবার, চেষ্টা-চরিত্তির শুরু করুন। চাঁদের রকেট ছাড়ল বলে। অ্যাপোলো ৮ ও ১০-কে কেন্দ্র করে চাঁদের আকাশ-প্রদক্ষিণ শেষ হয়েছে। এইবার স্বুরু হবে চাঁদে অবতরণ। এই চাঁদ বহুকাল থেকেই কবি-কল্পনার এক উর্বর ভূমি। তার দিকে তাকিয়ে আজ অবধি অনেকেই কবির খাতায় নাম লিখিয়েছেন। চাঁদকে দেখে কবি হয়ে উঠেছেন এমন কি বিজ্ঞানীও। এই প্রসঙ্গে এক বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানীর কথা মনে পড়ছে। স্যার উইলিয়াম হার্শেল নাম তাঁর। ১৭৮০ খৃস্টাব্দের ১২ই জুন তিনি একটি চিঠি লিখেছিলেন অপর এক বিজ্ঞানী ডঃ মাস্‌কেলীন-এর কাছে। হার্শেল লিখেছিলেন, 'আমাকে যদি চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যে যে কোনো একটিকে বেছে নিতে বলা হ'ত তো চাঁদকে আবাসভূমি করতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করতুম না আমি।'

প্রশ্ন উঠবে, কেন বিলম্ব করতেন না হার্শেল? কেন চাঁদের প্রতি তাঁর এই পক্ষপাতিত্ব? এ সব প্রশ্নের জবাব ঐ চিঠিতে তিনি নিজেই দিয়েছেন। বলেছেন, "চাঁদে গেলে চোখে পড়বে স্বর্গলোকের এক অপরূপ দৃশ্য! চাঁদের দেশ কত বিচিত্র পাহাড়-পর্বত ও উপত্যকায় পরিশোভিত!"

হার্শেল-এর অনুমানগুলোর কিছুটা হয়তো সত্যি। কিন্তু তবু বলবো, চিঠি লিখতে বসে কিছু ভুল করেছিলেন তিনি। তিনি ভেবেছিলেন, চাঁদে জনপ্রাণী আছে।

"জনপ্রাণী যে আছে সেখানে, তা একরকম স্বতঃসিদ্ধ সত্য",—এই ছিল তাঁর ধারণা। কিন্তু তাঁর চিঠিটির বয়স ১৮৯ বছর হতে চলল। এখন নিশ্চয় কেউ আর এই ধারণাকে আমল দেবেন না।

সকলেই একবাক্যে বলবেন এখন, চাঁদে জনপ্রাণী বা গাছপালার চিহ্নমাত্র নেই। অতএব আবাসস্থল হিসেবে আমাদের চেনা পৃথিবীর উত্তর-মেরু বা সাহারা মরুভূমিকে বেছে নিতে প্রস্তুত আছি বরং, কিন্তু চাঁদকে নয়।

কিন্তু তবু স্বপ্ন-দেখা চোখ মানুষের। অজানাকে জানবার আকাঙ্ক্ষা আদ্যিকাল থেকে তার শিরা-উপশিরায় সংক্রামিত। তাই অনেককেই বলতে শোনা যাচ্ছে, না হয় না থাকলুম চাঁদের দেশে। কিন্তু সেখানে একবার পাড়ি দিতে আপত্তি কি!

এই পাড়ি দেবার আয়োজনই এখন চলছে; এবং মানুষ না গেলেও মানুষের প্রেরিত রকেট এরই মধ্যে চাঁদের পৃষ্ঠদেশে কয়েকবার হানা দিয়েছে। সাড়ে চার শো কোটি বছরের বিচ্ছেদ দূর হয়েছে এতদিনে। এতদিন পর পার্থিব বস্তু চাঁদকে স্পর্শ করেছে।

১৯৫৯ খৃস্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। ঐদিন গ্রীনউইচ সময় রাত দশটা বেজে ২ মিনিট ২৪ সেকেণ্ডে রুশ-নির্মিত রকেট সর্বপ্রথম আঘাত করে চাঁদের পৃষ্ঠদেশকে। এই ঘটনার ২১ দিন পর ১৯৫৯ খৃস্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর রুশ-নির্মিত আর একটি রকেট চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে এবং তার আড়াল-করা দিকটির ছবি নেয়।

এর পরের ঘটনা আমাদের সকলেরই জানা। আমরা জানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রেঞ্জার, সারভেয়ার ও অ্যাপোলো সিরিজের রকেটগুলোকে কেন্দ্র করে এবং সোভিয়েট রাশিয়া লুনা সিরিজকে ঘিরে চাঁদে পাড়ি দেবার উদ্যোগ-আয়োজনকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এরই মধ্যে শাবল দিয়ে চাঁদের মাটি খুঁড়ে গবেষণার ব্যবস্থা পর্যন্ত হয়েছে। আর হয়েছে রকেটে করে চুম্বক পাঠিয়ে চাঁদের দেশে লোহার অস্তিত্ব পরীক্ষা করার ব্যবস্থা এবং ২০ ঘণ্টায়

১০ বার চাঁদ-প্রদক্ষিণের ব্যবস্থা। সম্প্রতি চাঁদের ১০ মাইল মাত্র দূর থেকে মানুষ ঘুরে এলো। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই সব অভিযান চাঁদে মানুষ পাঠানোর তুলনায় নেহাৎই ছোটখাটো। মানুষকে সেখানে যেতে হলে আয়োজনটা হওয়া চাই আরও অনেক বড় আকারের এবং আরও অনেক নিখুঁত!

অবশ্য এ ব্যাপারে পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দুটি দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার দিক থেকে চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই। গ্রহান্তরে পাড়ি দেবার আয়োজন ওরা বেশ ঘটা করেই করছেন। চাঁদে যাবার সুখস্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তুলেছে অ্যাপোলো প্রজেক্ট, এবং এজন্যে ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়েছে ৪০ শত কোটি ডলার। অর্থাৎ, আমাদের ভারতবর্ষের প্রথম তিন-তিনটি পরিকল্পনায় ১৫ বছরে যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, এর পরিমাণ তার চেয়েও বেশি। যতদূর জানি, এত বেশি ব্যয়বহুল পরিকল্পনার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। বিশেষ কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে এত অর্থ ব্যয় করার কথা পৃথিবীর মানুষ কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবে নি। কিন্তু না ভাবলে কী হবে! স্বপ্নাতীত অভাবনীয়ই সম্ভব হতে চলেছে আজ। 'অ্যাপোলো প্রজেক্ট'-এর উদ্যোক্তারা স্থির করেছিলেন, চাঁদের উদ্দেশ্যে 'সেটার্ন বুস্টার' ধরণের অতিকায় রকেট পাঠানো হবে; যার চলতি নাম হ'ল সেটার্ন সি-ফাইভ। ফন ব্রন-এর পরিচালনায় এই রাক্ষুসে রকেট গড়ে উঠেছে। পর্যায়ক্রম অনুযায়ী এর প্রথম তলাটি ১৭০ ফুট উঁচু এবং এই তলার ব্যাস ৪৩ ফুট। আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার প্রত্যেকটি ৮৯ ফুট করে উঁচু এবং ২২ ফুট ব্যাস-যুক্ত। অর্থাৎ, রকেটের মোট উচ্চতা ৩৩০ ফুট বা ১০০ মিটার। অ্যাপোলো ১০কে যে রকেট চাঁদের দিকে নিয়ে গেছে, তার

উচ্চতা অবিশ্যি এর চেয়েও কিছু বেশী,—প্রায় ৩৬৪ ফুট। এ ছাড়া পৃথিবী ছেড়ে ওঠবার সময় 'সেটার্ন সি-ফাইভ'-এর মোট ওজন দাঁড়ায় ২০ লক্ষ পাউণ্ড, যা ২৫টি 'বোয়িং-৭০৭' জেটবিমানের ওজনের সমান। প্রথম পর্যায়ে যাত্রাস্থল থেকে ওঠবার মুহূর্তে এই মহাশূন্যযানটিকে চালানো হয় ৫টি অতিকায় জেট ইঞ্জিনের সাহায্যে। এই ইঞ্জিনগুলোর প্রত্যেকটি ১৮ থেকে ২০ ফুট করে উঁচু এবং ১,৫০০,০০০ পাউণ্ড উর্ধ্বচাপ সৃষ্টি করার ক্ষমতাবিশিষ্ট। অর্থাৎ ৫টি জেটএঞ্জিন মিলে সমবেতভাবে সৃষ্টি করে ৭,৫০০০,০০০ পাউণ্ড চাপ, এবং এই চাপ হল দেড় কোটি অশ্বশক্তি বিশিষ্ট।

অতএব, বোঝা যাচ্ছে, রকেটটিকে শুধুমাত্র চলৎ-শক্তি দেবার জন্যই কী বিপুল পরিমাণ শক্তির দরকার! এবং এই শক্তির জন্যে আবার দরকার জ্বালানির। প্রথম পর্যায়ে পৃথিবী-ছেড়ে ওঠবার সময় 'সেটার্ন সি-ফাইভ'-এর প্রয়োজন হয় সেকেণ্ডে ১৫ টন করে জ্বালানির; এবং এই জ্বালানির মধ্যে থাকে দু'ভাগ কেরোসিন ও এক ভাগ তরল অক্সিজেন। এদিকে চাঁদযাত্রী রকেটের প্রথম পর্যায়ের স্থায়িত্বকাল ১½ মিনিট বা ১৫০ সেকেণ্ড। অতএব হিসেব করে পাচ্ছি, এইসময়টুকুর জন্যে 'সেটার্ন সি-ফাইভ'-এর ১,৩৫,০০০ টন জ্বালানির প্রয়োজন। কিন্তু মজার কথা হ'ল এই যে, যে ধরণের জ্বালানির কথা এখানে বলা হল তার ৬০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র পেলেও মাঝারি আকারের একটি মোটরগাড়ি সমগ্র সৌরজগৎ একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে পারে। এছাড়া 'সেটার্ন সি-ফাইভ' রকেটের জ্বালানি-সম্ভার প্রসঙ্গে এইটেই শেষ কথা নয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে যে পাঁচটি এঞ্জিনের দ্বারা এই রকেট সুসজ্জিত থাকে, তাদের সম্মিলিত শক্তি হ'ল ১ লক্ষ পাউণ্ড। সব মিলিয়ে প্রথম দু'টি পর্যায়ে যে পরিমাণ শক্তি উৎপাদন করতে হয় তা ২৪০,০০০ পাউণ্ড ওজনের

কোনো বস্তুকে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে উৎক্ষিপ্ত করার ক্ষমতা-সম্পন্ন হওয়া চাই। তৃতীয় পর্যায়ে এই বিরাট রকেটে গতিবেগ সঞ্চারিত হয় একটিমাত্র এঞ্জিন থেকে এবং তখন রকেট যে গতিশক্তি লাভ করে তা ৯০,০০০ পাউণ্ড ওজন সহ চাঁদের দিকে যাত্রা করার পক্ষে যথেষ্ট। অর্থাৎ, তখন পৃথিবীর নির্গমন গতিবেগকে ছাড়িয়ে রকেট প্রচণ্ড বেগে ছোটে প্রতিবেশী উপগ্রহ চাঁদের উদ্দেশ্যে। চাঁদে পৌঁছুতে গেলে মোট কী পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হবে তার? বিজ্ঞানীরা এর এক চমকপ্রদ হিসেব দিয়েছেন। বলেছেন, ১৫০ পাউণ্ড ওজনের এক-জন মানুষকে চাঁদে পাঠাতে হলে প্রয়োজন ২৩০,০০০ অশ্বশক্তির। অতএব, এ থেকেই আঁচ করা যাবে, ৯০,০০০ পাউণ্ড ওজনের রকেটকে চাঁদে পাঠাতে হলে কী বিপুল পরিমাণ শক্তির দরকার।

অবশ্য রকেটের ওজনকে কমাবার চেষ্টা চলছে। স্থির হয়েছে, মানুষবাহী 'সেটার্ন সি-ফাইভ' রকেটের মোট ওজন হবে ৮৫,০০০ পাউণ্ড। এ ছাড়া চাঁদযাত্রী এই মহাশূন্যযানে মোট থাকবে তিনটি অংশ বা কুঠুরী। প্রথম কুঠুরীতে থাকবেন দু'জন অভিজ্ঞ মহাকাশ-চারী এবং একজন বিজ্ঞানী। দ্বিতীয়টিতে থাকবে অভিযাত্রীদের রসদ, এঞ্জিন এবং জ্বালানি; আর তৃতীয়টিতে থাকবে চাঁদে অবতরণের সময় প্রয়োজনীয় যন্ত্রযান। এটি এমনভাবে গড়া হবে যাতে এর সাহায্যে দুজন মানুষ—একজন মহাকাশচারী ও একজন বিজ্ঞানী সহজেই চাঁদের পৃষ্ঠদেশে নেমে আসতে পারেন।

চাঁদে যেতে সময় লাগবে মোট ৩ দিন। এই সময়টুকুর মধ্যে অভিযাত্রীরা তাঁদের প্রয়োজনমাফিক জ্বালানি ব্যবহার করে রকেটের গতিপথ ঠিক রাখতে পারবেন। তারপর চাঁদের কাছাকাছি আনবার পরে রকেটের গতিকে বিপরীতমুখী করবেন

ওঁরা ; করবেন এমনভাবে যাতে চাঁদ থেকে ১০০ মাইল দূরে থেকে তাকে প্রদক্ষিণ করবার উপযোগী কক্ষপথের আওতায় আসা যায়। তারপর অভিযাত্রীদের মধ্যে দু'জন চাঁদে অবতরণের জন্যে গড়া মহাকাশযানটিতে প্রবেশ করবেন। প্রবেশের পর যানটিকে মূল রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন করবেন ওঁরা এবং তারপর চালাবেন অবতরণের উদ্যোগ-আয়োজন।

এই পর্বের প্রথমেই অবতরণের উদ্দেশ্যে নির্মিত যন্ত্রযানটির ক্ষুদ্র রকেট-এঞ্জিন চালু করা হবে এবং তারপর ধীরে ধীরে চাঁদের দিকে এগিয়ে যাবেন অভিযাত্রীরা ; চাঁদের পৃষ্ঠদেশ থেকে মাত্র ১০ মাইল দূরবর্তী একটি উপবৃত্তাকার পথে এসে পৌঁছুবেন। যদি কোনো বিপদ-আপদ দেখা দেয় তবে এইখান থেকেও ফিরে আসতে পারবেন ওঁরা ; মূল মহাকাশযান যা প্রায় ১০০ মাইল দূরে থেকে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করছে, তাতে আশ্রয় নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবেন। আর যদি সব কিছু নির্বিঘ্নে চলে তবে উপযুক্ত পরিমাণ জ্বালানি ব্যবহার করে অবতরণ-যানটির গতিবেগ কমিয়ে দেবেন অভিযাত্রীরা এবং ধীরে ধীরে নেমে যাবেন চাঁদের উপরিভাগে। অবশ্য অবতরণের উপযোগী স্থান বেছে নেবার জন্য কয়েক মিনিট পর্যবেক্ষণের সুযোগ পাওয়া যাবে। দরকার হলে অবতরণ-যানটিকে কিছুক্ষণ ধরে চালনা করা যাবে হেলিকপ্টার-এর মতো ; এবং তারপর উপযুক্ত জায়গা বুঝে তার চারটি পায়ের ওপর ভর করে চাঁদের দেশে নেমে আসা যাবে।

ফেরবার বেলায় ঠিক সময়ে অবতরণ-যানটির রকেট-এঞ্জিন চালু করতে হবে। ঐ সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে ঊর্ধ্বচাপ সৃষ্টি হয় দরকার-মতো এবং ঐ চাপ যাতে ১০০ মাইল দূরবর্তী চাঁদ-প্রদক্ষিণ-কারী মূল রকেটে অভিযাত্রীদের পৌঁছে দিতে পারে। চাঁদের

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অত্যন্ত অল্প ; তা ছাড়া ওখানে বাতাস নেই। তাই উপযুক্ত পরিমাণ উর্ধ্বচাপ সৃষ্টি করতে অভিযাত্রীদের খুব বেশী বেগ পেতে হবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন না। ওঁরা অভয় দিচ্ছেন, অবতরণ-যানটিকে নিয়ে উপরের দিকে উঠতে বিশেষ কষ্ট হবে না। এছাড়া চাঁদ-প্রদক্ষিণকারী মূল রকেটটিকেও ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া দুঃসাধ্য নয়।

মূল রকেটে পৌঁছে অভিযাত্রীরা পৃথিবীর দিকে যাত্রা করবেন ; এবং অবতরণ-যানটিকে পরিত্যাগ করবেন ১০০ মাইল দূরবর্তী চাঁদের ঐ কক্ষপথে। সে যানটি হয়তো যুগ যুগ ধরে কৃত্রিম একটি উপগ্রহ হিসেবে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করবে।

১৯৬৭ সালের ১৪ই জুলাই তারিখে আমেরিকার সার্ভেয়ার—৪ চাঁদ অভিমুখে যাত্রা করেছিল। এই মহাশূন্যযানটির মধ্যে ছিল চুম্বক, শাবল ও ঘুর্ণায়মান ক্যামেরা। চাঁদের বুকে লোহা আছে কি না, তা' চুম্বকের দ্বারা পরীক্ষা করার কথা ছিল।

সেদিন এই সংবাদ শুনে অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। অনেকেই প্রশ্ন করেছিলেন, কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে শুধুমাত্র এই সামান্য বস্তুটির জন্যে অধরার পিছনে না ছুটলেই কি ভাল হ'ত না ? তবে কি লোহা ছাড়াও মূল্যবান কিছু আছে সেখানে ? এমন কিছু আছে, পৃথিবীতে যা' পরশমণির মতোই দুর্লভ ?

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই তেজস্ক্রিয় কিছু পদার্থের কথা মনে এসেছিল অনেকের। অনেকেই প্রশ্ন করেছিলেন, তবে কি ইউ-রেনিয়ামের 'হেড্-কোয়ার্টার' সেখানে ? রেডিয়ামের যক্ষপুরী ? এ ছাড়া মহামূল্যবান সব ধাতব পদার্থ হামেশাই বুঝি সেখানে আলো ছড়ায় ? সোনার স্বর্গরাজ্য বুঝি সে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত ?

জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৌলতে এসব প্রশ্নের কিছু কিছু জবাব এরই

মধ্যে আমরা পেয়েছি। আমরা জেনেছি, চাঁদের ঘনত্বই এমন, যা' সেখানে সোনা, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি মূল্যবান পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের কোনো আশ্বাস দেয় না। বরং তার আকৃতি ও উপাদান পর্যালোচনা করলে মনে হয়, সেখানে আছে প্রধানত অক্সিজেন, সিলিকন, লোহা, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম ও ক্যালসিয়াম এবং এদের অধিকাংশই আছে যৌগিক অবস্থায়।

প্রশ্ন উঠবে, পৃথিবীতে বিরলদর্শন মহামূল্যবান সব পদার্থরা তবে কি একেবারেই নেই সেখানে? সে দেশের শিলাস্তূপে মাথা খুঁড়লেও কি এক ভরি সোনা বা এক গ্রাম ইউরেনিয়াম মিলবে না?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে ভূবিজ্ঞানীদের শরণাপন্ন হতে হয়। যাঁরা পৃথিবীতে ধাতব পদার্থের অস্তিত্ব নিয়ে গবেষণা করেন, দ্বারস্থ হতে হয় তাঁদের। ভূবিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবীর স্থান-বিশেষে যে বিশেষ এক এক ধরণের পদার্থ কেন্দ্রীভূত হয়, তার মূলে রয়েছে কয়েকটি প্রক্রিয়া। সেই প্রক্রিয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করে চৌম্বকত্বের হেরফের, জল ও তাপের সম্মিলিত গুণাগুণ, ক্ষয়ীভবন, পললধর্ম এবং কিছু জৈবিক ক্রিয়াপদ্ধতি। কিন্তু এদের অধিকাংশই চাঁদে অনুপস্থিত। সে দেশের সুদীর্ঘ ইতিহাসের কোনো বিশেষ পর্বেও এরা উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেছে বলে ভূবিজ্ঞানীরা মনে করেন না। বরং সকলেই জোর দেন এই বলে যে, চাঁদের শিলাস্তরে ও উপরিভাগে যে দুটি প্রয়োজনীয় ধাতব পদার্থ প্রচুর পরিমাণে পাবার সম্ভাবনা, তারা হল লোহা এবং নিকেল। বিজ্ঞানীদের ধারণা, উল্কাজনিত সংঘাত থেকেই চাঁদে আবির্ভূত হয়েছে ওরা এবং ওদের খনন ও সংগ্রহ করে পৃথিবীতে নিয়ে আসা যাবে। কিন্তু প্রশ্ন, আনতে গেলে যে পর্বতপ্রমাণ অর্থ ব্যয় হবে,

পৃথিবীর সম্পদ সে পরিমাণে বাড়বে কি? এ প্রশ্নের জবাবে কিশোর-কিশোরীরাও বলবে এবং এমন কি চাঁদে চরকা-কাটা বুড়ির অস্তিত্বে যারা বিশ্বাসী তারাও বলবে,—না, সম্পদ বাড়বে না তাতে।

তবে? তবে কেন এই রাজসূয় আয়োজন?

জানি, বিরুদ্ধবাদীরা বলবেন, আয়োজনটা সম্পূর্ণ হোক আগে। আগে ধৈর্য ধরে দেখা যাক, পাথরস্তূপের ভিতর থেকেই পরশমণি বেরিয়ে আসে কি না; তারপর যত খুশি আমাদের সমালোচনা করো। তা ছাড়া কত সুবিধে চাঁদে? মাধ্যাকর্ষণ সেখানে অল্প। অতএব শ্রমিক ভাইরা খুব অল্প পরিশ্রমে সেখানে অনেক বেশি কাজ করতে পারবে। আর সূর্যালোক থেকে কি প্রচণ্ড শক্তি পাওয়া যাবে সেখানে! যদি সেই শক্তিকে ধরে রাখা যায় এবং তারপর প্রয়োজনমাফিক লাগানো যায় কাজে, তবে একদিন চাঁদেই গড়ে উঠবে মানুষের নতুন স্বর্গ।

কথাগুলো শুনতে খুব ভাল লাগে। এমন কি সন্দেহ জাগে এক-একবার, সূর্যের অপরিসীম দাক্ষিণ্যভরা সেই স্বর্গলোকের সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে আছি বুঝি! কিন্তু আসল সত্যটা মনে এলেই সব স্বপ্ন তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ে। চাঁদের নির্মম জগৎটাকে স্পষ্ট দেখতে পাই তখন। তখন স্পষ্টই মনে হয়, বাতাস নেই সেখানে; জলও নেই। অতএব শাবল চালিয়ে ধাতু-সংগ্রহের কাজটা সেখানে কি খুব দুরূহ হবে না? বায়ুশূন্য সেই দেশে হাতুড়ি, কোদাল ও বেলচা কি খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়ে উঠবে না? এ ছাড়া চাঁদের শিলাস্তূপগুলোর তাপ-পরিচালনের ক্ষমতা খুব সামান্য। অতএব যন্ত্রপাতিগুলো আগুন হয়ে উঠতে কতক্ষণ আর সময় লাগবে?

উৎসাহীরা বলছেন, ভাবনার কিছু নেই। সব সমস্যারই ধীরে ধীরে সমাধান করবো আমরা। প্রথমে আসা যাক জল এবং বাতাসের প্রসঙ্গে। চাঁদে জল নেই বটে; কিন্তু সেখানকার বহু পদার্থের মধ্যেই জলের অণুগুলো বন্দী অবস্থায় আছে। এই শ্রেণীর পদার্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল সিলিকেট, পিচ্‌স্টোন ও সারপেন্টাইন। শেষোক্ত দুটি পদার্থ হল আগ্নেয়গিরিজাত; এবং আমরা যদি চাঁদের গঠন-বৈচিত্র্যে আগ্নেয়গিরির সামান্যতম প্রভাবের কথাও স্বীকার করি, তবে এ দুটি পদার্থের অস্তিত্বকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। পিচ্‌স্টোনে আছে শতকরা ৪ ভাগ জল; আর সারপেন্টাইনে জল আছে শতকরা ১০ ভাগ। এ ছাড়া 'কার্বনেসিয়াস্ ক্রন্‌ডাইট্' নামে এক শ্রেণীর উল্কাপিণ্ড আছে এবং চাঁদের পৃষ্ঠদেশে প্রচুর পরিমাণেই আছে এরা। এদের মধ্যে জলের পরিমাণ হল শতকরা ১০ থেকে ২০ ভাগ। ঐসব উল্কাপিণ্ডকে ৫০০ থেকে ১,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করলে ওদের থেকে জল বাষ্পাকারে বেরিয়ে আসবে। তারপর সেই বাষ্পকে তরল জলে ঘনীভূত করে নিলেই কাজ হাসিল। ঘনীভবনের সময় অবশ্য কিছু সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে; কিন্তু প্রয়োজনীয় তাপমাত্রায় যন্ত্রপাতিগুলো রাখতে পারলে এ সমস্যার সমাধান করা তেমন কিছু কঠিন হবে না।

এ ছাড়া চাঁদে বিদ্যুৎশক্তির জন্যে ভাবনার কিছু নেই। অসীম শক্তিধর সূর্য অকাতরে আশীর্বাদ বিলোচ্ছেন সেখানে; এবং সে আশীর্বাদের পরিমাণটা পৃথিবীর তুলনায় ঢের বেশি। চাঁদের মাত্র ১ বর্গকিলোমিটার এলাকা প্রতি ঘণ্টায় যে পরিমাণ সূর্যকিরণ পায় তা' দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ৪,০০০ গুণ অধিক বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হতে পারে। তুলনার

সুবিধের জন্যে জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রের কার্যকালও এখানে ১ ঘণ্টার মধ্যেই সীমিত রাখা হল।

অতএব, দেখা যাচ্ছে, চাঁদের সূর্যালোকিত দিকটিতে শক্তির অভাব কখনও ঘটবে না। সেখানে প্রয়োজন দেখা দিলেই বিরাট-কায় সব সৌরচুল্লী বানানো চলবে এবং বাতাস নেই বলে সৌর-শক্তির জয়যাত্রা সেখানে অটুট থাকবে। সেখানে 'লেন্স' বা 'মিরার'-এর গায়ে ধূলোবালি জমবে না কখনও এবং মাধ্যাকর্ষণ কম থাকায় যন্ত্রপাতিগুলোকে হাল্কা মনে হবে।

আবার এই যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হবে তা' দিয়ে চাঁদের অক্সিজেনযুক্ত সিলিকনকে গলানো সম্ভবপর। আর চাঁদের অক্সিজেনযুক্ত ম্যাগ্‌নেসিয়াম থেকে অক্সিজেনকে 'গ্যাস'-এর আকারে মুক্তি দেওয়া হবে 'ডি-সি' বিদ্যুতের সাহায্যে। এই বিদ্যুৎ আসবে সিলিকন, লোহা ও কিছু পরিমাণ অ্যালুমিনি-য়ামের সহযোগে গড়ে তোলা 'থার্মোকাপ্‌ল্' থেকে।

কিন্তু সৌরশক্তি সম্বন্ধে এতক্ষণ যা' কিছু বলা হল, তা' চাঁদের দিনের বেলাতেই পাওয়া সম্ভব। এইখানে প্রশ্ন উঠবে, চাঁদের সুদীর্ঘ রাত্রিতে তবে শক্তি জোগাবে কে? বিজ্ঞানীরা বলছেন, শক্তিকে মজুত করে রাখতে হবে। দিনের বেলার রোজগারকে রাত্রে ধীরে ধীরে খরচ করতে হবে। তবে যদি কেউ চাঁদের মেরুপ্রদেশে যায় তবে এ ব্যাপারে ভাবনার আর কিছুই থাকবে না। কারণ সেখানে দিগন্তের কাছাকাছি জায়গা-বরাবর সর্বক্ষণ ঘুরে বেড়ায় সূর্য এবং কখনই পুরোপুরি অস্ত যায় না।

কিন্তু এ সবই গেল সৌরশক্তির আশীর্বাদের কথা। এবার তার অভিশাপের প্রসঙ্গে আসা যাক। ভাবা যাক, চাঁদের দেশে থাকবার সময় উত্তাপের তারতম্য হেতু অভিযাত্রীদের কী ধরণের বিপদ হতে

পারে, সে কথা। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিপদের অনেকখানি নির্ভর করবে রকেটের বহিরাবরণের ওপর। তার আলোকে প্রতিফলিত করবার এবং শুষে নেবার ক্ষমতার ওপর। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মহাশূন্যের তাপমাত্রা খুব অল্প বটে, কিন্তু সূর্যের বিকিরণ-শক্তির প্রভাবে দিনের বেলায় এমন কি ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরেও শূন্যে অবস্থিত কোনো কঠিন বস্তুর উত্তাপ মানুষের সহ্যসীমার অতীত হবে। কারণ বস্তুটি যে অনুপাতে সূর্যের উত্তাপকে শুষে নেবে, সে অনুপাতে উত্তাপ-বিকিরণ করবে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, অ্যালুমিনিয়ামের বহিরাবরণ-বিশিষ্ট কোনো রকেট দীর্ঘক্ষণ ধরে মহাশূন্যে থাকলে তার তাপমাত্রা ৩৫০ থেকে ৪০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড অবধি উঠতে পারে। কিন্তু সেই রকেটকেই যদি আবার সাদা কোনো রঞ্জক পদার্থে আচ্ছাদিত করা যায় তবে তার তাপমাত্রা নেমে যাবে শূন্য ডিগ্রীর চেয়েও ৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড নিচে। এজন্যেই বিজ্ঞানীরা বলছেন, রকেটের বহিরাবরণের জন্যে এমন সব পদার্থ নির্বাচিত করতে হবে যাদের সাহায্যে তাপমাত্রাকে মানুষের সহনসীমার মধ্যে রাখা যায়। কিন্তু বিপদ হল, চাঁদের দেশে তাপমাত্রার এই সহনসীমা যে-কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। রকেটের বাইরের দিককার রঞ্জক পদার্থের আচ্ছাদন নষ্ট হয়ে যেতে পারে কোথাও এবং কোনো বিশেষ মুহূর্তে মসৃণ অ্যালুমিনিয়াম সূর্যকিরণের সংস্পর্শে আসবার ফলে মহাশূন্যযানের ভিতরকার তাপমাত্রা এত বেশি বেড়ে যেতে পারে, যার ফলে অভিযাত্রীরা কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই জ্বলে-পুড়ে নিঃশেষিত হবেন। এ ছাড়া রাত্রিকালে চাঁদের দেশের তাপমাত্রা হঠাৎ করে নেমে যাবে এবং তখন মহাশূন্যযানের বাইরেকার আচ্ছাদনের যদি এতটুকু হের-ফের হয় তো একমাত্র মৃত্যু দিয়েই

সে ত্রুটির প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। অতএব চাঁদের দেশের সর্বনেশে দিন ও রাত্রির হাত থেকে পরিত্রাণের পথ কোথায় ?

বিশেষজ্ঞরা অভয় দিচ্ছেন ; বলছেন, পথ আছে। মহাশূন্যযানকে যদি চাঁদের দেশের মাটির তলায় রাখা যায়, তবে হয়তো এ বিপদ থেকে পরিত্রাণ মিলতে পারে। এমন কি মাটির তলায় না রেখে মহাশূন্যযানটিকে যদি ফুটখানেক গভীর ধূলোবালি দিয়ে ঢেকে রাখা যায়, তবেও কাজ চলবে। এই ধূলোবালি এবং শিলাপাথর সংগৃহীত হবে চাঁদের দেশ থেকেই এবং এরাই মহাকাশচারীদের পরিত্রাতার কাজ করবে। এ ছাড়া এই ব্যবস্থা থেকে আরও কিছু সুবিধে পাবার সম্ভাবনা। এরূপ করলে ছোটখাটো উল্কাখণ্ডের আঘাত থেকে অভিযাত্রীরা রক্ষা পাবেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ হবে সহনশীল তাপমাত্রা। কারণ, চাঁদের দেশের ধূলোবালি এবং শিলাস্তরের তাপ-পরিচালন-ক্ষমতা খুব সামান্য। এত সামান্য যে সেখানকার মাটির মাত্র ১ গজ নিচেই তাপমাত্রা সমস্ত দিন ও রাত্রি ধরে প্রায় সমান থাকে। অবশ্য সে তাপমাত্রা অভিযাত্রীদের সুখে বসবাস করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। শূন্য ডিগ্রীর চেয়েও তা ৩০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড নিচে থাকে। অতএব, অনুমান করা যাচ্ছে, প্রচণ্ড শীত সেখানে এবং সে শীত থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে মহাশূন্যযানকে কৃত্রিম উপায়ে গরম রাখতে হবে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চাঁদের দারুণ শীত-গ্রীষ্ম থেকে পরিত্রাণের অন্য উপায়ও আছে ; এবং তা' হল সেখানকার কিছু প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকে কাজে লাগানো। চাঁদে এমন কিছু অঞ্চল আছে যেখানে আগে লাভাস্রোত প্রবাহিত হ'ত। ঐ লাভাস্রোতগুলো স্তব্ধ এখন ; শুধু এখন বলি কেন, লক্ষ লক্ষ বছর আগে থেকেই

ওরা স্তব্ধ। মৃত বা সুপ্ত আগ্নেয়গিরির কাছে এ ধরণের লাভাস্রোত পৃথিবীতেও চোখে পড়ে। এদের বৈশিষ্ট্য হল, ধীরে ধীরে এরা 'লাভা-টিউব' গড়ে তোলে এবং কালক্রমে এই 'টিউব'গুলো খাদ বা গিরি-গুহার রূপ নেয়। ঐ খাদ বা গিরিগুহার চারিদিকে কখনও আবার মসৃণ দেওয়াল গড়ে উঠতে দেখা যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই ধরণের 'লাভা-টিউব' চাঁদে আছে এবং চাঁদযাত্রীরা অনায়াসেই সেখানে আশ্রয় নিতে পারবেন। ঐ 'টিউব'-এর মধ্যে ঢুকে তার মুখগুলো বন্ধ করে দিতে হবে ; আর যদি তা করা যায়, তবে চাঁদের দেশের শীত-গ্রীষ্মের অত্যাচার থেকে চিরতরে মুক্তি।

কিন্তু এত সব আশ্বাসবাণী সত্ত্বেও উচ্চাভিলাষীদের অনেকেই ক্ষুব্ধ হচ্ছেন। বলছেন, শুধুমাত্র লোহা, নিকেল আর অ্যালুমিনিয়ামের লোভে ওই 'টিউব'-এর মধ্যে বাস করতে যাবো কোন্ দুঃখে ! আরও কিছু চাই !

চাঁদের টাইম-টেব্‌ল্ রচয়িতারা সান্ত্বনা দিচ্ছেন। বলছেন, হয়তো আরও অনেক কিছু মিলবে। হয়তো ধাতু-নিষ্কাশন ও বিমান-শিল্পের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় লিথিয়াম ও বেরিলিয়াম-এর সন্ধান পাওয়া যাবে চাঁদে।

এইখানে প্রশ্ন করেন অনেকেই, কতখানি পাওয়া যাবে ?

বিজ্ঞানীরা বলছেন, উল্লসিত হবার মতো বিরাট কিছু নয়। পৃথিবীতে যেমন পাওয়া যায় প্রায় তেমনই।

এদিকে মন মানে না উৎসাহীদের। ওঁরা শুধোন, চাঁদের আসল জিনিসগুলো কোথায় আছে, তা' পৃথিবীর ঘরে বসেই কেমন করে জানবো আমরা ? কেমন করে আগে থাকতেই চাঁদের রত্নপ্রসূ স্থানগুলোর হদিস পাবো ?

চাঁদের বর্ণালী বিশ্লেষণ করে এইসব প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন

বিজ্ঞানীরা। ওঁরা 'রেডিও-টেলিস্কোপ'-এর সাহায্যে ঘরে বসেই দূরের ঐশ্বর্যের পরিমাপ করছেন। অবশ্য পরিমাপটা সব সময় যে ঠিকমতো হচ্ছে, তা' নয়। কারণ, ৩৮০,০০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত চাঁদের ঘরোয়া খবর নিতে গেলে রেডিও-টেলিস্কোপ আরও অনেক বড় ও শক্তিশালী হওয়া চাই। কিন্তু তবু ঘরে বসে যত চেষ্টাই আমরা করি না কেন, চাঁদের ধাতব পদার্থগুলোকে খনন করতে হলে সেখানে যাবার ঝুঁকি আমাদের নিতেই হবে। ঘাঁটি স্থাপন করতে হবে সেখানে এবং সেই ঘাঁটি থেকে দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা চাঁদের যক্ষপুরীতে হানা দেবেন।

ধরে নেওয়া যাক, অভিযাত্রীদের স্বপ্ন একদিন সফল হবে; চাঁদে দুঃসাহসীদের বিজয়-নিশান উড়বে একদিন। কিন্তু সেদিন সমস্যা দাঁড়াবে, চাঁদের পদার্থগুলোকে কেমন করে ঘরে আনবো আমরা। বিশেষজ্ঞরা এ সমস্যারও সমাধান খুঁজে বের করেছেন। বলেছেন, চাঁদের আকৃতি ও ওজন কম বলে সেখান থেকে পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যবর্তী মাধ্যাকর্ষণশূন্য জায়গায় কোনো কিছু পাঠাতে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না। যে শক্তি ব্যয় করে পৃথিবী থেকে বিশেষ কোনো বস্তুকে আমরা চাঁদে পাঠাবো, তার ৩০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র ব্যয় করলেই সেই বস্তুটিকে চাঁদ থেকে ঠেলে মাধ্যাকর্ষণ-শূন্য জায়গায় পৌঁছে দেওয়া যাবে। কারণ, চাঁদ থেকে পৃথিবীতে আসবার সময় ঐ বস্তুটি যাত্রাপথের শতকরা ৯৯ ভাগই কৃত্রিম কোনো শক্তির সাহায্য না নিয়ে স্বাভাবিকভাবে এমনিতেই অতিক্রম করবে। মহাশূন্যের পথ ধরে কোনো বস্তুর এই যে আপনভাবে পথ-চলা, বিজ্ঞানীরা একেই বলে থাকেন 'ফ্রী ফল্'।

এই 'ফ্রী ফল্' আগামী দিনের চাঁদ-অভিযাত্রীদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওরা বলেন, চাঁদের খনিজ পদার্থ পৃথিবীতে আনবার

সময় রকেটের সাহায্য নেবো না আমরা। পদার্থগুলোর অধিকাংশকেই আনবো সরাসরি। অর্থাৎ পৃথিবীকে তাক করে চাঁদ থেকে ছুঁড়ে মারবো ওদের। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ থেকে ওদের মুক্তি দেবো এমনভাবে যাতে ওরা পৃথিবীর কোনো বিশেষ স্থানে এসে পৌঁছয়। কিন্তু এ ব্যাপারে আবার নতুন সমস্যা দেখা দেবার সম্ভাবনা। সমস্যাটি হল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে ঘিরে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, মহাশূন্য পথ বেয়ে আগত বিভিন্ন বস্তু পৃথিবী ও তার বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে এসে বিচিত্র সব আচরণ করতে পারে। বস্তুগুলোর মধ্যে যাদের আকৃতি বড়, হঠাৎ গতিবেগ কমে যাবার ফলে তাদের অনেকেরই জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাবার কথা। অপরদিকে খুবই ছোটখাটো যারা, যারা দেখতে অনেকটা ধূলিকণার মতো, তারা হয়তো কোনদিনই পৃথিবীতে নেমে আসবে না; বায়ুমণ্ডলের ওপর ভেসে বেড়াবে অনেকটা আগ্নেয়গিরি-নিঃসৃত ধূলিরাশির মতো এবং তারপর অতি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়বে বিরাট এক একটা অঞ্চল জুড়ে। কেন না, কোনো বস্তুকে বায়ুমণ্ডলের প্রতিহত করবার শক্তি সেই বস্তুটির আকৃতি ও ওজনের ওপর নির্ভরশীল। অতএব দেখা যাচ্ছে, চাঁদের কোনো পদার্থকে আনতে হলে সেই পদার্থটিকে নির্দিষ্ট একটা আকৃতির করে নেয়া দরকার। আকৃতি খুব বড় হলে চলবে না, পৃথিবীতে আসবার আগেই সে জ্বলেপুড়ে ছাই হবে; আবার ছোটো হলেও বিপদ, ধূলিকণার আকারে ছড়িয়ে পড়বে বিরাট এক অঞ্চল জুড়ে। অতএব বস্তু যদি বড় থাকে তো কেটে খণ্ড খণ্ড করতে হবে তাকে; আর যদি খুব ছোটো হয় তো খণ্ড খণ্ড অংশগুলোকে জুড়তে হবে। কিন্তু মনে রাখি যেন, জুড়লেও বিপদ, কাটলেও বিপদ। নিশানায় যদি ভুল হয় তো চাঁদের খনিজ অতিথিরা আমার-আপনার মতো নিরীহ লোকের মাথা ফুটো করে

দিতে পারে এবং সেই ফুটো আমাদের দেহ ভেদ করে সংক্রামিত হতে পারে ভূত্বক অবধি। অতএব এ ব্যাপারে সতর্কতা দরকার। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মাভৈঃ! সাহারা ও গোবি এতকাল ধরে শুধু আমাদের অশ্রদ্ধাই কুড়িয়েছে। কিন্তু এবার চাঁদের দৌলতে ওদের ইজ্জৎ বাড়বে। কেন না, প্রতিবেশী উপগ্রহের রত্নসম্ভারকে এসব জায়গাতেই নামিয়ে আনবো আমরা। লক্ষ্য রাখবো, নিশানা ঠিক করতে কয়েক মাইল হের-ফের হলেও পৃথিবীর মানুষের মাথাগুলো যাতে অক্ষত থাকে।

এত সব কাণ্ডকারখানার কথা শুনে আমরা শিহরিত হই। বলি, চমৎকার!

কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন করতে মন চায়,—ধরিত্রীর বুকে এখনও যে বিরাট খনিজসম্ভার রয়েছে, তা' আমরা পুরোপুরি কাজে লাগাচ্ছি কি? আমরা কি ভেবে দেখছি, সমুদ্রের জলে যে বিপুল পরিমাণ সোনা ও ইউরেনিয়াম রয়েছে তা' উদ্ধার করতে পারলে চাঁদে পাড়ি দেবার তুলনায় অনেক কম খরচে আমরা অনেক বেশি লাভবান হবো?

আশঙ্কা হয়, ভাবি নি। যদি ভাবতুম তবে চাঁদে গিয়ে সামান্য কিছু লোহা, নিকেল ও সোনা পাবার লোভে কোটি কোটি টাকা জলে ফেলতুম না। পৃথিবীর অনুন্নত ও অর্ধোন্নত দেশের ২০০ কোটি বুভুক্ষুর কান্না ঘুম ভাঙাত আমাদের; চাঁদের দৌলতের সুখস্বপ্ন দেখে রোমাঞ্চিত হবার পথে বাধার সৃষ্টি করত।

॥ চাঁদের বিচিত্র জগৎ ॥

বয়স হল চাঁদের। পণ্ডিতেরা বলেন, ৪৫০ কোটি বছর। বলেন, এই দীর্ঘ যুগ ধরে পৃথিবীর সঙ্গী সে। সে পৃথিবী-প্রদক্ষিণ করছে আমাদের নিকট প্রতিবেশী হিসেবে।

পৃথিবীর জন্মলগ্নে চাঁদেরও জন্ম। পৃথিবী যখন গড়ে উঠছিল, চাঁদও তখন গড়ার পথে। কিন্তু চাঁদের সঙ্গে পৃথিবীর তফাৎ হল এই যে, পৃথিবী ধীরে ধীরে শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণ করল; ধীরে ধীরে অনেক কিছু পরিবর্তন হল তার। অপরদিকে চাঁদের শৈশব আর কাটল না। শৈশবেই জল-বাতাসকে ছুটি দিয়ে সেই যে সে নিঃস্ব হয়ে বসল, সে নিঃস্বতা থেকে আর মুক্তি পেল না কিছুতেই। অতএব, আজও চাঁদকে যখন আমরা দেখি, তখন তার ৪৫০ কোটি বছর আগেকার শৈশবের কথাই আমাদের মনে পড়ে। মনে হয়, জন্মলগ্নেই জল-বাতাসকে হারিয়ে বসে আছে বলে উপগ্রহটিতে পরিবর্তনের ঝড় বয় নি কখনও। কখনও ক্ষয় ও ভাঙনের তাণ্ডব দেখা দেয় নি। তাই এখনও তার দিকে তাকালে কোটি কোটি বছর আগেকার শৈশবের স্মৃতিগুলো খুঁজে পাওয়া যাবে।

পৃথিবী বা তার প্রতিবেশী গ্রহগুলোর শৈশবকে খুঁজে পাওয়া আজ বড় কঠিন। কারণ, জল-বাতাস আছে ওদের মধ্যে; এবং আছে বলেই ওদের বহিরাবরণে অহরহ পরিবর্তনের ঢেউ উঠছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই পরিবর্তন অনেক কিছু অনর্থের মূলে। এদেরই জন্যে ওঁরা সৌরজগতের খাঁটি জন্মঠিকুজী তৈরি করতে

পারছেন না। কিন্তু যদি চাঁদে যাওয়া যেত একবার, যদি তার বহিরাবরণকে ভাল করে একবার পরীক্ষা করা যেত, তবে হয়তো সৌরজগতের ঠিকুজীটা গড়া সম্ভব হত নিখুঁতভাবে।

সবাই জানেন, এই ঠিকুজী গড়ার আয়োজন আজ ভালভাবেই চলছে ; চাঁদে পাড়ি দেবে বলে মানুষ আজ বদ্ধপরিকর। এদিকে চাঁদের দেশ সম্বন্ধে বিচিত্র সব খবর সংগৃহীত হচ্ছে ; এবং এরই মধ্যে সে দেশ সম্বন্ধে যতটুকু জেনেছি আমরা, তা দিয়ে সেখানকার একটা ছবি আঁকা যেতে পারে। ছবিটা স্পষ্ট হবে না হয়তো ; কিন্তু যা' হবে, বৈচিত্র্য-সৃষ্টির দিক দিয়ে তা'ও কম নয়।

চাঁদকে পর্যবেক্ষণ করলে প্রধানত দু'প্রকার শিলাস্তরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর শিলাস্তর এবড়ো-খেবড়ো এবং উঁচুনিচু। দেখতে এরা হাল্কা রঙের। কারণ, যে পরিমাণ সূর্যকিরণ এরা পায়, তার শতকরা ১৮ ভাগ পর্যন্ত এদের থেকে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। অপর এক শ্রেণীর শিলাস্তরের বর্ণ অপেক্ষাকৃত গাঢ়। এরা সূর্যকিরণের শতকরা ৬ থেকে ৭ ভাগ পর্যন্ত প্রতিফলিত করবার ক্ষমতাবিশিষ্ট এবং আকৃতির দিক দিয়ে এরা বেশ মসৃণ ; এত মসৃণ যে এদের হঠাৎ দেখলে কোন তরল পদার্থের উপরিভাগ বলে ভ্রম হয়। প্রথমোক্ত শ্রেণীর শিলাস্তরগুলোকে বলা যেতে পারে চাঁদের পর্বতমালা। বিরাট এক-একটি অঞ্চল জুড়ে এদের অবস্থান। তবে চাঁদের দক্ষিণ গোলার্ধে এদের সংখ্যাধিক্য। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, উপগ্রহটির দৃশ্য অংশের দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে আছে এরা ; আর চাপা ও প্রায়-সমতল ভূভাগগুলো জুড়ে আছে সে দেশের এক-তৃতীয়াংশ। প্রাচীন যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ভুল করে এদের 'ম্যারিয়া' বা সমুদ্র বলে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু আসলে সমুদ্র

এরা নয়। শক্তিশালী দূরবীনের ভিতর দিয়ে চাঁদের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, এরা হল পর্বত-প্রাচীরে ঘেরা গোলাকার এক-একটি অঞ্চল। আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন 'ক্রেইট্যার'। এই কেইট্যারগুলো চাঁদের চাপা অংশ-গুলোতে যেমন আছে ঠিক তেমনি আছে পার্বত্য অংশেও। সে দেশের সর্বত্র এদের ছড়াছড়ি। বিজ্ঞানীরা হিসেব কষে বললেন, শুধুমাত্র চাঁদের দৃশ্য অংশেই ১ কিলোমিটারের চেয়ে বেশি ব্যাস-বিশিষ্ট 'ক্রেইট্যার'-এর সংখ্যা ৩ লক্ষ। এ ছাড়া ছোটখাটো আরও অনেক ক্রেইট্যার' আছে সেখানে ; এত বেশি আছে যাদের গুণে শেষ করা আজও অবধি সম্ভব হয় নি। চাঁদে ২০০ কিলোমিটারের চেয়ে বেশি ব্যাসযুক্ত 'ক্রেইট্যার'-এর সংখ্যা পাঁচ। সবচেয়ে বড় 'ক্রেইট্যার' ক্লেভিয়াস-এর ব্যাস হল ২৩০ কিলোমিটার। এ ছাড়া ১০০ থেকে ২০০ কিলোমিটার ব্যাসবিশিষ্ট ৩২টি 'ক্রেইট্যার' আছে চাঁদে।

তবে চাঁদের দেশের কোনো একটি 'ক্রেইট্যার' বা পর্বতের সঙ্গেই অপরটির হুবহু মিল নেই! সেখানকার সর্বত্র সামঞ্জস্যহীনভাবে ছড়িয়ে আছে ওরা। দ্বিতীয়ত, যে সব প্রাচীর ওদের ঘিরে রেখেছে তাদের সবই 'ক্রেইট্যার'-গুলোর আয়তনের তুলনায় খুব কম উচ্চতা-বিশিষ্ট।

এইখানে প্রশ্ন উঠবে, চাঁদের রাজ্যে পর্বতের উচ্চতা আমরা মাপছি কী করে? বিশেষজ্ঞরা বলবেন, এর জবাব অতি সহজ। উচ্চতা আমরা মাপছি পর্বতগুলোর ছায়ার সাহায্য নিয়ে। শুধু পর্বত কেন, উঁচু-নিচু আরও যত জায়গা আছে চাঁদে, আশেপাশে তাদের ছায়া পড়ে থাকে। চাঁদের দিগন্ত থেকে সূর্যের উচ্চতা অনুযায়ী এই সব ছায়ার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। ছায়াগুলো সবচেয়ে দীর্ঘ

হয় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়। এদিকে চাঁদের আকাশে সূর্য কোথায় কখন থাকে, তা খুব নিখুঁতভাবে জানা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর। অতএব ছায়াগুলোর হ্রাসবৃদ্ধি ঘটছে কেমনভাবে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় ওরা কী আকৃতি ধারণ করছে, তা যদি আমরা জানতে পারি তবে সূর্যের অবস্থানের সঙ্গে মিলিয়ে ওদের উচ্চতার হিসেব করা কঠিন কিছু নয়।

এইখানে বলে রাখা যেতে পারে যে, চাঁদের দেশের পাহাড়-পর্বত ও উঁচু-নিচু স্থানগুলোর হিসেবও বিজ্ঞানীরা খুব সঠিকভাবেই করছেন এবং হিসেবে ১০ মিটারের চেয়ে বেশি ভুলচুক হচ্ছে না। এ ছাড়া 'ক্রেইট্যার'গুলোর আয়তন মাপবার ব্যাপারেও বিজ্ঞানীরা পিছিয়ে নেই। পৃথিবী থেকে চাঁদের বিভিন্ন অংশের কৌণিক দূরত্বের কথা স্মরণে রেখে এই আয়তনের হিসেব করছেন ওঁরা। ওঁদের হিসেব থেকেই পাচ্ছি, 'ক্রেইট্যার' বা বাটির মতো গোলাকার গর্তগুলোর চারিদিকে আছে দুর্গাকার যে সব পাহাড়-প্রাচীর তাদের কোনটিই খুব একটা উঁচু নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ক্লেভিয়াস নামক অতিকায় 'ক্রেইট্যার'-টির প্রাচীর তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো থেকে বড় জোর ১,৬০০ মিটার উঁচু। আর 'ক্রেইট্যার'-টির সর্বনিম্ন তলদেশ থেকে প্রাচীরের সর্বোচ্চ অংশের উচ্চতা হল ৪,৯০০ মিটার। অতএব দেখছি, ২৩০ কিলোমিটার ব্যাসযুক্ত 'ক্লেভিয়াস'-এর বিরাট গর্ত ও বিপুল আয়তনের তুলনায় তার প্রাচীরটিকে নেহাৎই নগণ্য বলা যায়। এত নগণ্য যে কেউ যদি এর মাঝখানে দাঁড়ান তো এই প্রাচীরকে দেখতেই পাবেন না। কেন না, প্রাচীর তখন দিগন্তের অন্তরালে হারিয়ে যাবে।

এ ছাড়া চাঁদের দেশের এই 'ক্রেইট্যার'গুলোর আরও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। এদের তলদেশ আশেপাশের স্থানগুলোর

তুলনায় নিচে নেমে গেছে অনেকখানি। এবং যতটা করে নিচে নেমেছে ওরা, নামতে গিয়ে যে পরিমাণ জায়গা দখল করেছে, পাহাড়-প্রাচীরগুলোর আয়তন হিসেব করলেও ঠিক সেই পরিমাণ জায়গাই পাওয়া যায়। এ থেকে মনে হয়, প্রাচীরগুলোর উপাদান এসেছে গোলাকার ঐ সব গর্ত থেকে। আর মনে হয়, ঐ সব গর্ত এবং প্রাচীর একই শক্তির প্রভাব থেকে জাত ; অর্থাৎ, যে শক্তি গর্তগুলোকে সৃষ্টি করেছে, ঠিক সেই শক্তিই আবার গড়ে তুলেছে ঐ প্রাচীরগুলোকে।

খুব ছোট 'ক্রেইট্যার'-গুলোর চারিপাশে অবশ্য কোন প্রাচীর নেই। ওদের দেখলে মনে হয়, শুধুমাত্র গর্ত ওরা, চাঁদের দেশের খানিকটা করে জায়গা ওরা দখল করে আছে।

অতএব দেখছি, চাঁদের 'ক্রেইট্যার'গুলোকে সত্যিকারের কোন পর্বত বলা যায় না। বরং বলা যায়, গুটিকার মতো চিহ্নে আচ্ছন্ন অদ্ভুত কতকগুলো জায়গা। এ ধরণের জায়গার বিশিষ্ট কয়েকটি উদাহরণ হল ১৪৪ কিলোমিটার ব্যাসযুক্ত 'টলেমিয়াস,' 'অ্যালফন্-সাস্' (১২০ কিলোমিটার), 'থিয়োফিলাস্' (১০৬ কিলোমিটার), 'কোপার্নিকাস্' (৯০ কিলোমিটার), 'আর্কিমেডিস্' (৮০ কিলো-মিটার), 'অ্যারিস্টিলাস্' (৫৬ কিলোমিটার) প্রভৃতি।

স্বল্প উচ্চতা এবং বিরাট ঢাল চাঁদের 'ক্রেইট্যার'-প্রাচীরগুলোরই শুধু বৈশিষ্ট্য নয়, সেখানে আরও যে সব পাহাড় আছে, তাদের মধ্যেও এই বিশিষ্টতা চোখে পড়ে। উদাহরণ হিসেবে চাঁদের একটি উল্লেখযোগ্য পাহাড় 'পিটন'-এর কথা ধরা যাক। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়ে দেখলে একে একটি উন্নত পর্বতশৃঙ্গ বলে মনে হয়। মনে হয়, এ যেন বিস্তীর্ণ এক সমতলভূমির উপর একাকী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। যেন খুব খাড়া এই শৃঙ্গটি। কিন্তু সম্প্রতি ম্যাঞ্চেস্টার

বিশ্ববিদ্যালয়ে এর ছায়ার যে পরিমাপ করা হয়েছে তা থেকে জানা যায়, খাড়া এ মোটেই নয়; বরং চাঁদে গিয়ে কেউ যদি দাঁড়ায় তো দেখবে, এ হল চ্যাপ্টা আকারের অতি সাধারণ একটি পাহাড়। কারণ, 'পিটন'-এর উচ্চতা ২,৩০০ মিটার হলেও তার ভূমিদেশের বিস্তৃতি প্রায় ২৮ কিলোমিটার। এ ছাড়া সুনির্দিষ্ট কোন চূড়া নেই 'পিটন'-এর এবং চাঁদে গিয়ে এ থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে দাঁড়ালেও মনে হবে, পাহাড়টির শিখরদেশ চোখে পড়ছে না।

চাঁদের অন্যান্য পাহাড়-পর্বতগুলোকে বিশ্লেষণ করেও বিজ্ঞানীরা ঠিক এই একই সিদ্ধান্তে এসেছেন। অর্থাৎ ওঁরা বলতে চেয়েছেন, যথার্থ খাড়া কোন পর্বতশৃঙ্গ সেখানে আদৌ নেই। বিজ্ঞানীদের এই সিদ্ধান্ত থেকে অনুমান করে নিতে হয়, চাঁদে গিয়ে পাহাড়-পর্বতের কোন চিত্তাকর্ষক দৃশ্য চোখে পড়বে না। বরং চেখে পড়বে চ্যাপ্টা, গম্বুজাকৃতি ও ঢিবির মতো যে সব পাহাড় সেগুলো নেহাৎই রুক্ষ ও একঘেয়ে। তাই সন্দেহ হয় এক-একবার, পৃথিবীর দুঃসাহসী পর্বত-অভিযাত্রীরা চাঁদে গিয়ে রহস্য ও রোমাঞ্চের খোরাক খুঁজে পাবেন না। অভিযানে বেরিয়ে তুষার বা হিমবাহের সাক্ষাৎ পাবেন না ওঁরা, প্রকৃতির কোন হঠাৎ-পরিবর্তন বা হঠাৎ কোন তুষার-ঝড় ওঁদের সঙ্গে শত্রুতা করবে না; এবং এ সব কিছুর চেয়েও বড় কথা, এমন কিছু দুর্গম স্থান বা খাড়া পর্বতপ্রদেশ ওঁদের অতিক্রম করতে হবে না, দশ জন সাধারণ লোকের চোখে যেগুলো ভীতিকর। অর্থাৎ চাঁদের দেশের পর্বত-অভিযানে বৈচিত্র্য থাকবে না কোথাও; এবং থাকবে না বলেই অসাধারণ কোন বীরত্বের জন্যে অভিযাত্রীদের ভাগ্যে বাহবাও জুটবে না। অথচ ওঁদের পরিশ্রম করতে হবে প্রচুর। মাইলের পর মাইল এগোতে হবে এবং সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পরও ওঁরা দেখবেন, শিখর মনে করে পাহাড়ের যে অংশে

এসে পৌঁছেছেন তা'কে পাহাড়ের সর্বোচ্চ অংশ বলে ভেবে নিতে কিছুতেই মন চাইছে না। মন বলছে, পৃথিবীতে উন্নত কোন পাহাড়ের চূড়ায় উঠলে অপরূপ সব দৃশ্য চোখে পড়ে ; কিন্তু এখানে কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না তার। এদিকে শিখরের সন্ধানে বেরিয়ে দুর্ভোগের একশেষ। প্রতি মুহূর্তে অকসিজেনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে। এ ছাড়া দিন যদি হয় তো সূর্যের শাসনে আর রাত্রি হলে শীতের অত্যাচারে পরিস্থিতি প্রতি মুহূর্তেই প্রাণান্তকর হয়ে উঠছে। অবশ্য সন্দেহ নেই, চাঁদের দেশে পাহাড় বেয়ে উঠতে অভিযাত্রীদের কম পরিশ্রম হবে। কারণ, মাধ্যাকর্ষণ সেখানে স্বল্প। কিন্তু সমস্যা হল, সেই স্বল্প মাধ্যাকর্ষণের সুযোগ নিয়ে উল্লসিত হবার মতো শুভ মুহূর্ত আদৌ সেখানে আসবে কি ? সেখানকার ভয়াবহ দিনরাত্রি পর্বত-অভিযাত্রীদের সামনে আদৌ কি কোন আশার জাল বুনতে পারবে ?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, না। আশান্বিত হবার মতো কোন উপকরণ চাঁদের পর্বত-অভিযান থেকে মিলবে না। অভিযাত্রীরা কোন দিক দিয়েই উৎসাহিত বোধ করবেন না সেখানে। এবং সেখানে বসে দূরবীক্ষণের ভিতর দিয়ে কেউ যদি ফেলে-আসা পৃথিবীর দিকে তাকান, তবে তাঁর অনুশোচনাই হবে। মনে হবে, বড় ভুল করেছি ; পৃথিবীকে উপেক্ষা করা ঠিক হয় নি। তার হিমালয়ের হাজার ভাগের এক ভাগ বৈচিত্র্যও এখানে অনুপস্থিত।

তবে বৈচিত্র্য চাঁদের দেশে একেবারেই যে নেই তা' নয়। 'ক্রেইট্যার' এবং 'ম্যারিয়া'গুলো ছাড়া সেখানে আছে গম্বুজাকৃতি একধরণের পদার্থ এবং বিচিত্র সব আলোকরশ্মি। কিন্তু খুবই নগণ্য পরিমাণে আছে এরা। চাঁদের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে আছে 'ক্রেইট্যার' এবং 'ম্যারিয়া'।

'ক্রেইট্যার'গুলোর উৎপত্তি কী করে হল তা' নিয়ে এ যাবৎ অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে সকলেই একমত যে ওদের সব ক'টির উৎপত্তি একভাবে হয় নি ; এ ছাড়া একই সময়ে গড়ে ওঠে নি ওরা। 'ক্রেইট্যার'গুলোর উৎপত্তি সম্বন্ধে দু' প্রকার মতবাদ চালু আছে। প্রথমোক্ত মতবাদে বিশ্বাসীরা বলছেন, বাহ্যিক কোন শক্তির প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে ওরা—চাঁদের পৃষ্ঠদেশের সঙ্গে উল্কা, ধূমকেতু বা গ্রহিকার (asteroids) সংঘর্ষের ফলে ওদের উৎপত্তি হয়েছে ; আর শেষোক্ত মতবাদে আস্থাশীলদের ধারণা, চাঁদের আভ্যন্তরীণ প্রভাবই ঐ সব ক্রেইট্যার-সৃষ্টির মূলে। ওঁরা বলে থাকেন, চাঁদের তরল পদার্থ ও 'গ্যাস'গুলো ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছিল যখন, যখন ওরা উপগ্রহটির আশ্রয় থেকে মুক্ত হয়ে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছিল, তখনই ঐ সব 'ক্রেইট্যার' গড়ে ওঠে। এ ছাড়া এদের সৃষ্টিতে চাঁদের দেশের আগ্নেয়গিরির অবদান থাকাও অস্বাভাবিক কিছু নয়।

গ্যালিলিওই প্রথম চাঁদের পৃষ্ঠদেশের অসমতলতার কথা উল্লেখ করেন। ১৬১০ খৃস্টাব্দে এ-সম্পর্কে নিজস্ব পর্যবেক্ষণের কথা যখন তিনি ঘোষণা করেন তখন বিশ্বজোড়া বিতর্কের তুফান উঠেছিল। এই ঘটনার ৫৭ বছর পর রবার্ট হুক চাঁদের দেশের 'ক্রেইট্যার'দের কথা আরও বিস্তারিতভাবে জানালেন। হয়তো বা বাইরের কোন কোন বস্তুর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ওদের সৃষ্টি হয়েছে, এই কথা বললেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর এই মতবাদ নিয়ে দেখা দিল তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা। বাইরের শক্তির প্রভাবকে একদল লোক বিনা দ্বিধায় মেনে নিলেন। অপর এক দল এ নিয়ে সুরু করলেন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এখানে শেষোক্তদের পথ ধরেই এগোব আমরা। আমরা দেখবার চেষ্টা করব,

বাইরের বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে সংঘাতের অবকাশ চাঁদের দেশে আছে কি না।

এই আলোচনা সুরু করতে গেলে প্রথমেই আমাদের মনে রাখা দরকার, মহাশূন্যের যে পথ ধরে পৃথিবী ও চাঁদ সূর্য-প্রদক্ষিণ করে, তা' একেবারে ফাঁকা নয়; একেবারে শূন্যতা নেই সেখানে। বরং সেখানে আছে নানা আকৃতির ও নানা ওজনের বিচিত্র সব বস্তু। সূর্যলোক থেকে আগত ইলেকট্রনরা আছে সেখানে। আবার আছে অতি ক্ষুদ্রকায় ধূলিকণাজাতীয় বস্তু। সৌরজগতের উৎপত্তির সময়কার অবশেষ ওরা। ওদের অবারিত পদসঞ্চার প্রধানত বায়ুশূন্য স্থানে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, মহাশূন্যে এই ধূলিকণাজাতীয় পদার্থ ও ইলেকট্রনরা তো আছেই, এ ছাড়া আছে ছোট-বড় উল্কা, গ্রহিকা এবং ধূমকেতু। এদের কক্ষপথের আওতায় চাঁদ পড়তে পারে কখনও; এবং যদি পড়ে তো এদের সঙ্গে তার সংঘর্ষ ঘটা মোটেই বিচিত্র নয়। চাঁদ বায়ুশূন্য বলে সংঘর্ষটা সেখানে পৃথিবীর তুলনায় বড় আকারের হবে এবং ধরে নেওয়া যেতে পারে, ৪৫০ কোটি বছর ধরে সূর্য-প্রদক্ষিণের পথে এই ধরণের সংঘর্ষ সেখানে বহুবার হয়েছে।

এবার উদাহরণের সাহায্যে এই সংঘর্ষের স্বরূপ-উপলব্ধির চেষ্টা করা যাক। ধরে নেওয়া যাক, ১০ লক্ষ টন ওজনবিশিষ্ট একটি উল্কা সেকেণ্ডে ৩০ কিলোমিটার গতিবেগে চাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। এখন এই ধরণের একটা বিরাট বস্তু যদি এইপ্রকার প্রচণ্ড গতিবেগে চাঁদকে এসে আঘাত করে, তবে থামবার আগে অবধি উপগ্রহটির পৃষ্ঠদেশ ভেদ করে বেশ খানিকদূর এগোবে সে; এবং এগোবে বুলেটের গতিতে। এদিকে সংঘর্ষের পূর্বে উল্কাপিণ্ডটির মধ্যে যে শক্তি সংহত ছিল, তা' হারিয়ে যেতে পারে না। অন্য

এক মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ ঘটবে তার। প্রধানত উত্তাপের আকারে দেখা দেবে এই শক্তি এবং এই উত্তাপ এত মারাত্মক হবে যে, সংঘর্ষের সঙ্গে সরাসরি লিপ্ত চাঁদের বিশেষ অঞ্চলটি বাষ্পে পরিণত হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই বাষ্পের তাপমাত্রা হবে ১,০০০,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

বলা বাহুল্য, দারুণ উত্তপ্ত এই বাষ্প উল্কাপিণ্ডের তলায় চাপা পড়ে থাকতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গেই ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটবে তার এবং তার প্রভাবে সংঘর্ষস্থলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। আর উল্কাপিণ্ডের চারদিকে যে কঠিন পদার্থ থাকবে, পরিমাণে তা' খুব বেশি হবে না। কারণ, সংঘর্ষের সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশ পদার্থই বাষ্পীভূত হবে এবং ছড়িয়ে পড়বে মহাশূন্যে। এ ছাড়া পদার্থের কিছু অংশ চাঁদের বিরাট কোনো এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়াও বিচিত্র নয়।

এদিকে বিস্ফোরক পদার্থের সাহায্যে পৃথিবীতে যে সব পরীক্ষা হয়েছে, তাদের সাহায্যে চাঁদের কোন কোন 'ক্রেইট্যার'-সৃষ্টির ব্যাখ্যা করা যায়। দেখা যায়, অনেক 'ক্রেইট্যার'-এর জন্ম উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষ থেকে হলেও হতে পারে। কিন্তু এইভাবে চাঁদের বিভিন্ন শ্রেণীর 'ক্রেইট্যার'-উৎপত্তির ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ 'থিয়োফিলাস্', 'কোপারনিকাস্' প্রভৃতি কিছু 'ক্রেইট্যার' আছে চাঁদে, যাদের আকৃতি অর্ধচন্দ্রাকার বাটির মতো এবং যাদের মাঝখানে আছে পর্বত-শৃঙ্গের মতো উঁচু জায়গা। আর 'ক্লেভিয়াস্', 'টলেমি', 'অ্যাল্‌ফনসাস্' প্রভৃতি 'ক্রেইট্যার'গুলোর ভূমিদেশ সম্পূর্ণ সমতল। এদের মাঝখানে কেন্দ্রীয় কোন পর্বত-শৃঙ্গ চোখে পড়ে না। বরং এদের দিকে তাকালে মনে হয়, পার্শ্ববর্তী 'ম্যারিয়া'গুলোর মতোই এরাও ধূসর বর্ণের। এই শেষোক্ত শ্রেণীর 'ক্রেইট্যার'গুলোর

সৃষ্টি উল্কা থেকে হয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন না। উপরন্তু অনেককেই বলতে শোনা যায়, পৃথিবীর পরীক্ষাগুলো থেকে উল্কার সঙ্গে চাঁদের সংঘর্ষের যে কাল্পনিক চিত্র উদ্ঘাটিত হয় তার সঙ্গে প্রথমোক্ত 'ক্রেইট্যার'দের কিছুটা মিল আছে। অবশ্য এই মিল এমন কিছু নয়, যা' আমাদের কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে পারে। কারণ, প্রথমোক্ত শ্রেণীর 'ক্রেইট্যার'গুলোর মধ্যেও অনেক সময় প্রকৃতিগত বিভিন্নতা চোখে পড়ে। এই প্রসঙ্গে 'কোপারনিকাস্'-জাতীয় কয়েকটি গভীর 'ক্রেইট্যার' বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই শ্রেণীর 'ক্রেইট্যা'র-এর কোন কোনটির কেন্দ্রীয় উচ্চভূমি থেকে আলোক-রশ্মি বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। স্পষ্ট চোখে পড়ে, সেই রশ্মি-গুলো শুঁড়ের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকটা দূর অবধি ছড়িয়েছে ওরা এবং কেন্দ্রীয় উচ্চভূমিটিকে ভিত্তিমূল করে ওরা যেন বৃত্তাকার খানিকটা জায়গা জুড়ে ডোরা-কাটা রশ্মিজালের সৃষ্টি করেছে। এই দৃশ্য দেখে অনুমান করা অন্যায় নয় যে, উল্কার সঙ্গে সংঘর্ষের ইঙ্গিত মিলছে এখানে এবং এই সংঘর্ষ থেকেই চাঁদের পৃষ্ঠদেশের বেশ খানিকটা অংশ যে একদিন ছিটকে বেরিয়ে এসে-ছিল, তা'রও প্রমাণ মিলছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে অসুবিধে হল এই যে, এ জাতের সব রকম 'ক্রেইট্যার'-এর ব্যাখ্যা উল্লিখিত উপায়ে করা চলে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'থিয়োফিলাস্' নামক 'ক্রেইট্যার'টি গভীর ; কিন্তু ওতে এধরণের আলোকরশ্মি একে-বারেই অনুপস্থিত। এ ছাড়া উল্কার সঙ্গে জড়িয়ে চাঁদের 'ক্রেইট্যার'-দের ব্যাখ্যা করার পথে অন্য অন্তরায়ও আছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, অন্তরায়টি ভূকম্পনসংক্রান্ত সমস্যার মধ্যে নিবদ্ধ। ওঁদের ধারণা, অতিকায় সব উল্কা চাঁদকে আঘাত করে থাকলে তাদের প্রভাব ভূকম্পনের আকারে সমগ্র উপগ্রহটিতে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য ; এবং

এ ধরণের কম্পন সত্যি যদি সেখানে বার বার হয়ে থাকে, তবে চাঁদের 'ক্রেইট্যার'-প্রাচীরগুলো বা পাহাড়-পর্বতগুলো নিশ্চয় আজও অবধি টিঁকে থাকত না।

অতএব দেখছি, চাঁদের জগৎ নিয়ে ভাবনার অবধি নেই। যুগে যুগে অনেক গবেষণা হয়েছে সে দেশ নিয়ে। তাই এখন প্রশ্ন করছেন অনেকেই, মহাকাশচারীরা কি সে গবেষণায় নতুন কিছু আলোকপাত করতে পারবেন ? কয়েক শতাব্দী ধরে পুঞ্জীভূত হয়েছে যে ভাবনা, মহাকাশচারীরা পারবেন তা'র জট খুলতে ?

চাঁদের স্বর্গ

শত বিশ্বামিত্রের শপথ শোনা যাচ্ছে ; অনেককেই বলতে শুনছি, নতুন স্বর্গলোক সৃষ্টি করবো আমরা ; গড়ে তুলবো নতুন ইন্দ্রলোক। তপস্যার মাহেন্দ্রলগ্ন সমাগত হওয়ার প্রতীক্ষা শুধু ; শুধুমাত্র সিদ্ধির স্বর্ণশিখরে দাঁড়িয়ে চাঁদে ঘাঁটি স্থাপন করার অপেক্ষা। তার পরেই সেই স্বর্গলোক হাতের মুঠোয় আসবে আমাদের ; আমরা হয়ে উঠবো খুদে এক-একটি দেবরাজ।

বলা বাহুল্য, এ শপথ বড় শ্রুতিমধুর ; এমন কি রোমাঞ্চকরও বটে। আর রোমাঞ্চ কে না চায়! দেবরাজের অমিত শক্তির এমন কি ছিটেফোঁটারও অধীশ্বর হতে গিয়ে কার না হৃদয় আকুলিত হয়! অতএব, বুঝতেই পারছি, চাঁদকে ঘিরে এই যে এত উৎসাহ-উদ্দীপনা, এর মূল কারণটা কোথায়।

কিন্তু বিপদ হল, এ যুগের বিজ্ঞানীরা বিশ্বামিত্রের মতো মিতবাক নন। প্রায়ই প্রয়োজনের তুলনায় বেশি কথা বলেন ওঁরা এবং লাভের অঙ্ক জমা পড়বার আগেই খরচের হিসেবটা কষে ফেলেন। ফলে, যা' এখনও পাই নি, তা' নিয়ে অযথা পুলকিত হই আমরা এবং যা' পেয়েছি তাকে নেহাৎই খেলো ভেবে অশ্রদ্ধায় দূরে সরিয়ে রাখি। ফলে, বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যৎ ও নিকটের চেয়ে দূর প্রিয় হয়ে ওঠে আমাদের এবং আমরা সাম্প্রতিক সমস্যার দিকে না তাকিয়ে আগামী দিনের সুখস্বপ্নে বিভোর হই।

হাল আমলে এই ধরণের বিপদ ঘটেছে চাঁদকে নিয়ে। তার স্বর্গলোকের যে-চিত্র এঁকেছেন বিজ্ঞানীরা, তা আমাদের ভুলিয়ে

রাখার গান গাইছে। আমরা ভাবছি, হাজার ত্রিশঙ্কুর বেদনাকে বুকে নিয়ে আর কতকাল স্পুটনিক-সহযোগ পৃথিবী পরিক্রমা করবো ? অথবা, আর কতকাল চাঁদকে খানিকটা দূর থেকে প্রদক্ষিণ করেই ঘরে ফিরবো ? ভাবছি, কবে পাড়ি দেবো চাঁদের দেশে ?

এদিকে বিজ্ঞানীরা চুপচাপ বসে নেই। রাষ্ট্রশাসকরা নির্দেশ দিয়েছেন, কল্পনা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গড়ে-তোলা চাঁদের দেশের 'ডকুমেণ্টারী' ছবিগুলো জনসাধারণকে দেখানো হোক। দেখাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। 'ডকুমেণ্টারী' ছবির 'অপারেটর'-এর ভূমিকা নিয়েছেন সব। বলছেন, আর ভাবনা নেই ; চাঁদের দেশে গেলে অযুত সমস্যার সুরাহা হবে ; লক্ষ সুখের সিংহদ্বার খুলে যাবে।

কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি যেন, সিংহদ্বার খুলে গেল। চাঁদে পৌঁছলুম আমরা। তারপর সেখানে বসে নতুন উদ্যমে পৃথিবীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু করলুম।

কত সুবিধে চাঁদে! জল-বাতাস নেই সেখানে। মেঘ-বৃষ্টির উপদ্রব নেই। অতএব সেখানে বসে যত খুশি পৃথিবীকে দেখুন। প্রাণ-ভরে নিরীক্ষণ করুন আদ্যিকালের ধরিত্রীকে।

পৃথিবীতে থেকে পরীক্ষা চালাবার হাজার অসুবিধে। বায়ুমণ্ডল শত্রুতা করে আমাদের সঙ্গে। মেঘলোক বিরুদ্ধতা করে। এ ছাড়া ধূলোবালি চারিপাশে ছড়িয়ে থেকে অনুক্ষণ আমাদের মূল্যবান গবেষণায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। তাই পৃথিবীতে বসে নক্ষত্রজগৎ, গ্রহলোক ও প্রতিবেশী উপগ্রহ চাঁদ সম্বন্ধে জানতে গিয়ে অহরহ হোঁচট খাই আমরা। অপরিসীম যত্নে গড়ে-তোলা রাক্ষুসে দূরবীন-গুলো আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করছে দেখে আহত হই।

কিন্তু চাঁদে এসব অসুবিধে নেই। রাক্ষুসে দূরবীনগুলো সেখানে রাক্ষসের স্বভাবধর্মকে অটুট রাখবে। অকাতরে তথ্যরূপ আহার্য

আত্মসাৎ করবে ওরা এবং ওদের অপরিমেয় দাক্ষিণ্যে আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার হঠাৎ অস্বাভাবিকরকম স্ফীত হয়ে উঠবে।

কিন্তু তবু প্রশ্ন করেন অনেকেই, চাঁদে বসে পৃথিবীকে ভালোভাবে দেখতে পাবো কি? পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও মেঘলোক তখনও কি আমাদের দৃষ্টিপথকে অবগুণ্ঠিত করবে না?

বিজ্ঞানীরা অভয় দিচ্ছেন। বলছেন, না; করবে না। অনেক দূরে আছে বলে অবগুণ্ঠনের বেড়াজাল সৃষ্টি করার বিশেষ সুযোগ পাবে না সে। আর সুযোগ যদি সে পায়ও, তো' তা' হবে যৎসামান্য। অতএব মা ভৈঃ! চাঁদে বসে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে পৃথিবী-পর্যবেক্ষণের সুযোগ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত।

এখন পৃথিবীতে বসে চাঁদের ৩০০ কি বড় জোর ৪০০ গজ অবধি দীর্ঘ বস্তুগুলোকে দেখতে পাই আমরা। কিন্তু এরপর চাঁদ থেকে যখন পৃথিবীকে দেখবো তখন অবস্থাটা অন্যরকম দাঁড়াবে। তখন দেখবো, পৃথিবীর এমন কি ৭০।৮০ গজ দীর্ঘ বস্তুগুলোও স্পষ্ট চোখে পড়ছে আমাদের। আমরা স্পষ্ট দেখছি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং এমন কি বিজ্ঞান-কলেজকে।

তবে মজার কথা হল, এ সব কিছু সম্বন্ধে মোটেই আগ্রহী নন চাঁদ-বিশারদরা। ওঁদের দৃষ্টি এমন সব রত্নের উপর সীমাবদ্ধ, যারা সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ চাঁদে বসে 'ম্যানসান'-শোভিত শহরগুলোর খবর রাখতে চান ওঁরা; ওঁরা উঁকি মেরে দেখতে চান, পৃথিবীর শক্তিশালী রকেট-কেন্দ্রগুলো কোথায় আছে, কোন্ সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে পাচার করা হচ্ছে পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার।

সত্যকে অস্বীকার করে লাভ নেই, চাঁদে বসে এই সবকিছুই দেখবেন ওঁরা। ওখান থেকে ক্ষেপণাস্ত্রের গোপন ঘাঁটিগুলো সহজেই ওঁদের নজরে পড়বে। এমন কি পৃথিবীর যানবাহন ব্যবস্থা সম্বন্ধেও

ওয়াকিবহাল থাকবেন ওঁরা। দরকার হলে বড় বড় শহরগুলোর ওঁরা 'ম্যাপ' তৈরি করবেন। আর পৃথিবীর কোথাও যদি কোনো বিপদ দেখা দেয় তো চাঁদ থেকে বেতার-মারফৎ খবর পাঠানো হবে। খবর পৌঁছুতে সময় লাগবে না বেশি ; মাত্র ১'২৮ সেকেণ্ডই যথেষ্ট।

অতএব দেখছি, সত্যসত্যই স্বর্গলোকের চাবিকাঠি আছে চাঁদের দেশে। আর আছে পৃথিবীতে নন্দনকানন প্রতিষ্ঠার গুহ্যসূত্র।

আবহাওয়ার অতর্কিত পরিবর্তন পৃথিবীতে নন্দনকানন-স্থাপনের একটি বড় অন্তরায়। কখন্ কোন্ দিক দিয়ে যে টাইফুন দেখা দেবে, টর্নাডো কেমন করে যে ছোবল মারবে আমাদের, আবার কখন্ যে কোথায় খরার দহনে আর্তনাদ করে উঠবে বুভুক্ষুর দল, তার আগাম খবর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা পাই নে। এবং পাই নে বলেই অন্যায়ভাবে আসামীর কাঠগড়ায় প্রতিনিয়ত আবহাওয়া-বিজ্ঞানীদের দাঁড় করাতে আমরা কসুর করি নে। আর সত্যি বলতে কী, অতি-বৃষ্টির পূর্বাভাস পেলে অনাবৃষ্টির জন্যে প্রস্তুত হই আমরা, আর যদি শুনি যে অনাবৃষ্টি অবধারিত, তবে বন্যা-নিয়ন্ত্রণের সংকল্প করি। অর্থাৎ, সোজা কথায় 'আবহাওয়ার পূর্বাভাস' নামক বস্তুটা আমার-আপনার কাছে উঁচুস্তরের একপ্রকার ধাঁধার সামিল এবং আব-হাওয়া বিজ্ঞানীরা আমাদের হাস্যরসের স্রোতস্বিনীকে সঞ্জীবিত রাখবার অবিরাম প্রস্রবণ।

চাঁদ-বিশারদরা বলছেন, আবহাওয়া-বিজ্ঞানীদের দুর্দিন দূর হবে এইবার। চাঁদ মূর্তিমান মুক্তির রূপ ধরে ওঁদের সামনে আবির্ভূত হবে। কেন না, চাঁদের দেশে বসে পৃথিবীর আবহাওয়া সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর নিতে পারবো আমরা। পৃথিবীর লোকদের আগে থাকতেই আমরা জানিয়ে দিতে পারবো, ঝড়-তুফান হবে কোথায়,

কোথায় হিমেল হাওয়া হতভাগ্যদের দংশন করতে করতে ছুটে যাবে। অতএব যথেষ্ট সময় হাতে পাবে সবাই। সময় থাকতেই সবাই সাবধান হতে পারবে। চাঁদে বসে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় সমগ্র পৃথিবীপৃষ্ঠকে একবার করে দেখা যাবে বলে সবাই এ থেকে উপকৃত হবে।

এ ছাড়া আরও কত সুবিধে চাঁদে! একবার সেখানে যেতে পারলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কল্পিত স্বর্গলোকের দেখা পাবার কত সম্ভাবনা! সূর্য ও নক্ষত্রজগৎ নতুন এক রূপে দেখা দেবে সেখানে। সেখানে আঁধারের বুক চিরে বেরিয়ে-আসা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে প্রতিভাত হবে। অথচ পৃথিবীতে বসে মহাবিশ্বের সমগ্র ঐশ্বর্যকে প্রত্যক্ষ করা কোনমতেই সম্ভব নয়। কারণ, মহাশূন্যের পথ ধরে ছুটে-আসা আলোকরশ্মির অধিকাংশই প্রতিহত হয় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে। পৃথিবীতে বসে বিশ্বজগতের যে আলোক আমরা দেখি, তার প্রকৃত আলোক সে তুলনায় অনেক বেশি বৈচিত্র্যমণ্ডিত।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই বৈচিত্র্যের স্বাদ মিলবে চাঁদে। সে দেশে বাতাস নেই বলে সেখানে দাঁড়ালে সব সময়েই বিশ্বলোকের একই চিত্র আমাদের সামনে ভেসে উঠবে। এবং এর চেয়েও বড় কথা, চাঁদে গেলে চরাচরজোড়া অনন্ত এক রাত্রিকে প্রত্যক্ষ করবেন অভিযাত্রীরা। দূরের জ্যোতিষ্কলোক থেকে আগত আলোকরশ্মির বর্ণালী-বিশ্লেষণ করে ওঁরা দেখবেন, অদৃষ্টপূর্ব সব রঙের দেখা মিলছে। বর্ণালীতে এমন কিছু আলোকরশ্মি চোখে পড়ছে, পৃথিবীতে চিরকাল যারা অদেখাই থেকে যেত। অর্থাৎ, চাঁদের পর্যবেক্ষণাগারে বসে এত অল্প সময়ে এত বেশী জানবেন বিজ্ঞানীরা, জ্যোতিষ্কলোক সম্বন্ধে এত বেশী পাণ্ডিত্য অর্জন করবেন

যে ওঁদের মনে হবে, জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞানসমুদ্রে তরী ভাসিয়েছেন ওঁরা, আর পৃথিবীর হতভাগ্যরা বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে প্রাগৈতিহাসিক কিছু কু-সংস্কার ও অপরিণত কিছু ধারণাকে সম্বল করে মান্ধাতার আমল থেকে গড়ে-ওঠা পঙ্ককুণ্ডের তীরে বসে আছেন।

তবে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাই শুধু নন, পদার্থবিজ্ঞানীরাও স্বুখস্বর্গের আস্বাদ পাবেন চাঁদে। বায়ুশূন্য সেই দেশে ওঁরা যে ল্যাবরেটরী গড়ে তুলবেন, তা' হবে পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার আদর্শস্থল।

পরমাণু-ভাঙা যন্ত্রের কথা আমরা জানি। পরমাণুর নিউক্লিয়সের গঠন ও গুণাবলী আবিষ্কার করা যে কত কঠিন, সে কথাও আমাদের অজানা নয়। এরই মধ্যে বহুবার শুনেছি আমরা যে বিভিন্ন পদার্থকে পরমাণু-ভাঙা যন্ত্রের মধ্যে রেখে ওদের নিউক্লিয়সগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত করানো হয় এবং এজন্য সব কিছু যন্ত্রপাতিকে রাখতে হয় বায়ুশূন্য স্থানে। পরীক্ষাস্থলটি সম্পূর্ণ-ভাবে বায়ুশূন্য হলেই পদার্থগুলো পরমাণুর গায়ে ধাক্কা খেয়ে তাদের গতি হারিয়ে ফেলবে না এবং এই গতিকে অটুট রাখবার জন্যেই পরীক্ষণীয় পদার্থকে বায়ুর কবল থেকে পুরোপুরি মুক্তি দিতে হবে।

পৃথিবীতে পদার্থকে এইপ্রকার মুক্তির সুযোগ দেওয়া খুবই কঠিন। 'নিউক্লিয়ার অ্যাক্‌সিল্যারেইটর' স্থাপন করতে গিয়ে বিরাট একটি স্থানকে বায়ুশূন্য রাখা বড় সহজ কথা নয়। কিন্তু তবু একথা মানতেই হবে, মানুষ আজ অসাধ্যসাধন করছে। আজ এমন কি আধ মাইল ব্যাসবিশিষ্ট বায়ুশূন্য চক্রাকার টানেলে পরমাণুর নিউক্লিয়স নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। কিন্তু এত বড় একটি জায়গাকে নিশ্ছিদ্র রাখা অত্যন্ত কঠিন। কোথাও এক রত্তি এক ফুটো দিয়ে সামান্যতম বায়ু অনুপ্রবেশ করলেও সমগ্র পরীক্ষা

বানচাল হবার সম্ভাবনা। এ ছাড়া সমগ্র পরীক্ষাকেন্দ্রটিকে বাইরের পরমাণু থেকে মুক্ত করার কাজটাও পর্বতপ্রমাণ বটে। কিন্তু চাঁদে সম্পূর্ণ খোলা জায়গাতেই পরমাণু-ভাঙা যন্ত্র গড়ে-তোলা যেতে পারে। এবং তারপর সেই যন্ত্রকে পরিচালনা করাও দুঃসাধ্য কিছু নয়। কেন না মাধ্যাকর্ষণ অল্প সেখানে; আর অল্প বলেই যন্ত্রপাতির ভারী অংশগুলোকে সেখানে সহজেই জোড়া দেওয়া সম্ভব। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পৃথিবীতে যে চুম্বকের ওজন ৫০,০০০ টন চাঁদে তার ওজন দাঁড়াবে মাত্র ৮,০০০ টন। অতএব, সোনালী ভবিষ্যৎকে দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি, চাঁদে অতিকায় সব 'নিউক্লিয়ার অ্যাক্সিল্যারেইটর' গড়ে উঠছে এবং ওদের কাছে মস্কো বা জেনেভার যন্ত্রগুলোকে মনে হচ্ছে নেহাৎই সেকেলে। প্রশ্ন উঠবে, ঐ অতিকায় যন্ত্রদানবদের রসদ যোগাবে কে? কোথা থেকে ওদের শক্তি আসবে? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর উত্তর অতি সহজ। শক্তি আসবে সূর্যকিরণ থেকে। বায়ুমণ্ডল নেই বলে মার্তণ্ডদেবের অকৃপণ আশীর্বাদকে সরাসরি সেখানে কাজে লাগানো যাবে।

এ ছাড়া চাঁদের দেশে গবেষণার আরও বহুরকম সুবিধে। প্রাথমিক কসমিক রশ্মির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের হদিস মিলবে সেখানে। এই কসমিক রশ্মি আজও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক বিরাট বিস্ময়। কোথা থেকে আসে ওরা, কী দিয়ে ওরা গঠিত, এসব কথা আজও অবধি আমরা সঠিকভাবে জানতে পারি নি। আর আমাদের এই অজ্ঞতার মূলে আছে বায়ুমণ্ডল। কেন না বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বভাগে বিভিন্ন গ্যাসের যে পরমাণুগুলো আছে তাদের সঙ্গে প্রাথমিক কসমিক রশ্মির অবিরাম সংঘর্ষ ঘটছে। ফলে আমাদের পৃথিবীতে আসছে যে কসমিক রশ্মি, তার প্রায় সবই দ্বিতীয়বার

বিকিরিত হচ্ছে ; এবং তাই যদি হয় তো প্রশ্ন দাঁড়ায়, প্রাথমিক কসমিক রশ্মির প্রকৃত শক্তি কতটুকু ? কোন্ কোন্ রাসায়নিক উপাদান দিয়ে এ বস্তুটি গঠিত ?

অবশ্য কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে এবং আকাশে উৎক্ষিপ্ত রকেটের সাহায্যে কসমিক রশ্মি সম্বন্ধে গবেষণার কাজ এরই মধ্যে পুরোদমে চলছে। কিন্তু এ গবেষণায় পর্যবেক্ষকের স্বাধীনতা কতটুকু ? প্রতি মুহূর্তে সময়ের কড়াক্রান্তি হিসেব রাখা, বেতার-সংকেতের আশায় সর্বক্ষণ ওৎ পেতে বসে থাকা কি কম ঝামেলার কাজ ?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঝামেলা খুবই বেশি, সন্দেহ নেই। এবং এ থেকে অব্যাহতি-লাভের তাগিদটা জরুরী হয়ে পড়েছে বলেই চাঁদে অবিলম্বে ল্যাবরেটরী গড়ে তোলা দরকার।

চাঁদে যেতে পারলে 'ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনীয়ার'রাও স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পাবেন। আর কে না জানে যে 'হাই ভ্যাকুয়াম্ টেকনিক'-এ কাজ করতে গিয়ে ওঁরা গলদঘর্ম হন। পরীক্ষার সময় যন্ত্রপাতিকে কাঁচের আধারের মধ্যে রাখেন ওঁরা। তারপর সেই আধারটিকে বায়ুশূন্য করে তার চারিদিক খুব ভালভাবে বন্ধ করে দেন। পরীক্ষাকালে যন্ত্রপাতির সামান্যতম অদলবদল দরকার হলেও বিপদ। কাঁচের আধারটিকে ভাঙ্‌তে হয় তখন এবং আবার একটি নতুন আধারে যন্ত্রপাতিগুলোকে পুরতে হয়। এ ছাড়া সমগ্র আধারটিকে বায়ুশূন্য করে তার চারিদিক এঁটে দেওয়ার হাঙ্গামা তো আছেই। অপরদিকে চাঁদে বায়ুশূন্য পরিবেশের জন্যে মোটেই ভাবতে হবে না। কারণ, সে দেশের সবটাই বায়ুশূন্য। অতএব দেখছি, 'হাই ভ্যাকুয়াম্ টেকনিসিয়ান'রা চাঁদে যাবার জন্যে উতলা হলে অন্যায় কিছু করবেন না। তবে

কয়েকটি ব্যাপারে আগে থাকতেই সতর্ক হতে হবে ওঁদের ; স্পেস্-স্যুট পরতে হবে এবং স্যুটের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে বায়ু-সঞ্চালনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বায়ু আসবে চাঁদের দেশের মাটির তলা থেকে। সেখানে চাঁদের বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য বিশ্লেষণ করে এ বস্তুটিকে প্রচুর পারমাণে মজুত করে রাখবার কথা। কিন্তু মনে রাখা দরকার, এ কথাও চাঁদের আসল তত্ত্বকথার তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।

কারণ, বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশ্বজোড়া পারমাণবিক যুদ্ধ দেখা দিলে চাঁদই হবে আমাদের রক্ষাকর্তা। কারণ, তখন রকেটে করে সরাসরি প্রতিবেশী উপগ্রহে পাড়ি দেবো আমরা।

এ সম্বন্ধে পৃথিবীর তথাকথিত কিছু 'গার্জেন' বলছেন, পাড়ি না দিয়ে নাকি উপায়ও থাকবে না। কেন না, পারমাণবিক যুদ্ধ ঘটা করে লাগলে সমগ্র পৃথিবীটাই তেজস্ক্রিয় পদার্থে ঢেকে যাবার সম্ভাবনা। এবং যদি একবার তা হয় তবে এই তেজস্ক্রিয়তার কবল থেকে পৃথিবীর মুক্ত হতে কয়েক হাজার বছর সময় লাগবে। এইখানে প্রশ্ন দাঁড়ায়, এই এতদিন ধরে মানুষ থাকবে কোথায় ? কোথায় আশ্রয় পাবে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত জীব?

বিশেষজ্ঞরা জবাব দেন, চাঁদে। চাঁদে যেতে পারলে মাতা বসুন্ধরার উন্নত সন্তানরা রক্ষা পাবে। আর অপরদিকে বসুন্ধরাও কয়েক হাজার বছরের অবসরে তেজস্ক্রিয়তার জ্বালা জুড়িয়ে নিতে পারবে।

এইখানে বসুন্ধরার কিছু নিরীহ সন্তান প্রশ্ন করতে পারে, চাঁদে যাবার টিকিট ঠিক সময়ে মিলবে তো? না কি টিকিটগুলো সংরক্ষিত থাকবে বিত্তশালীদের জন্যে? অথবা থাকবে তাদের জন্যে যারা বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ নামক 'গাঁয়ে না মানে আপনি মোড়ল' ?

যারা সাধারণের ওপর অযথা 'গার্জেনী' করতে গিয়ে পৃথিবীকে মহাশূন্যের বুকে সমাধি দিতে চলেছে ?

সন্দেহ হয়, পারমাণবিক যুদ্ধ বাধলে চাঁদের টিকিট মহার্ঘ তো বটেই, দুষ্প্রাপ্যও হবে। এবং আমার-আপনার নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে থাকবে সে টিকিট। আমরা ট্রেনের টিকিটেরই পয়সা জোটাতে পারি নে। আবার চাঁদের ! শুনলে বন্ধু-বান্ধবরাও হেসে লুটিয়ে পড়বে যে। বলবে, চিত্রগুপ্তের খাতায় অনেক পুণ্যি জমা পড়েছিল ; তাই কালেভদ্রে ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর কামরার পাদানীতে ঠাঁই পাও। কিন্তু মনে রেখো, পৃথিবীর কয়েক কোটি লোক ট্রেন এখনও চোখেই দেখে নি। অতএব খবরদার ! চাঁদমুখী 'সেটার্ন সি-ফাইভ্' রকেটের দিকে ভুলেও হাত বাড়িয়ো না যেন !

এইখানে প্রশ্ন উঠবে, পারমাণবিক যুদ্ধ বাধলে আমার-আপনার অবস্থা তবে কী দাঁড়াবে ? এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। এত সহজ যে খোলসা করে বললে মূল প্রশ্নটাকেই হাস্যকর প্রতিপন্ন করা হবে। অবস্থা আমাদের কিছুই দাঁড়াবে না। কারণ কোনকিছুতে দাঁড়াবার আগেই আমরা পঞ্চভূতে বিলীন হবো ; আর আমাদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু দুর্ভাগ্য, যাঁরা তেজস্ক্রিয়তার প্রত্যক্ষ গ্রাস থেকে মুক্তি পাবেন এমন কিছু দুর্ভাগ্য হয়তো দেখবেন, তাঁদের গায়ের চামড়া খসে খসে পড়ছে, আর দূর-দিগন্তে মানব-সভ্যতার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িয়ে রকেট ছুটছে মাঝে মাঝে। ছুটছে চাঁদের দিকে।

ধরে নেওয়া যাক, পৃথিবীর মৃত্যুলগ্নে কিছু বুদ্ধিমান লোক অমরত্বের প্রয়াসী হবে। ওরা সময় বুঝে যাত্রা করবে চাঁদের দেশে। কিন্তু তবু সমস্যা থেকে যাবে, চাঁদে যাবার পর ওদের বুদ্ধির ভাণ্ডারটি অটুট থাকবে তো ? দীর্ঘদিন সে দেশে থাকলে

ওদের আকৃতি-প্রকৃতি পৃথিবীর মানুষদের থেকে আলাদারকম হবে না তো?

এসব প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ডের দোহাই দেন। বলেন, চাঁদের দেশে গিয়ে মানুষের আকৃতি-প্রকৃতি বদলাবে কি না, তা' এখনই সঠিক করে বলা শক্ত; তবে তার আয়ু যে বাড়বে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, আয়ু বাড়বে সেখানে গিয়ে মানুষের মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ড কিছু সুযোগ-সুবিধে পাবে বলে।

এইখানে মস্তিষ্কের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। সবাই জানি আমরা যে, মানবদেহের এই অংশটি হল সবচেয়ে উন্নত ও রহস্যময়। একে বাদ দিলে আমাদের দেহের অন্য সব কিছুই দ্বিতীয় শ্রেণীর। অনেক অনুন্নত প্রাণীরই চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকার শক্তি আমাদের চেয়ে অনেক উঁচুদরের। এ ছাড়া আমাদের হাত-পাগুলোও যৎসামান্য শক্তির অধিকারী। এমন অনেক জীব আছে যাদের হাতের শক্তি আমাদের দশ গুণ, যাদের পা আমাদের চেয়ে বহু গুণ জোরে চলে। কিন্তু আমাদের দেহের একটি অংশেরই কোন তুলনা নেই; আর সে অংশটি হল মস্তিষ্ক। মানবজাতির যত কিছু উন্নতি ও যা' কিছু কৃতিত্ব, সব কিছুর মূলে আছে এই অপরূপ বস্তুটি। এর উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতির কর্মক্ষমতা মানুষের হাত-পায়ের শক্তিকে বিপুল পরিমাণে বাড়িয়েছে। কিন্তু তবু একথা অস্বীকার করা চলে না যে, কৃত্রিম উপায়ে আমরা যতরকম মস্তিষ্কই সৃষ্টি করি না কেন, প্রকৃতিদত্ত মস্তিষ্কের কাছে সেগুলো নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর।

মস্তিষ্ক আছে আমাদের খুলির সংকীর্ণ পরিসীমার মধ্যে। কিন্তু কর্মক্ষমতার দিক দিয়ে সংকীর্ণ সে মোটেই নয়। হৃৎপিণ্ড অবিরাম

অক্সিজেনযুক্ত রক্ত পাঠাচ্ছে তার মধ্যে; এবং হৃৎপিণ্ডের এই নিরলস ক্রিয়ার দৌলতেই সে তার প্রতিপত্তি অটুট রাখছে।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হলে মস্তিষ্কের পক্ষে কাজ চালানো সম্ভব নয়। আপন কার্যকারিতা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে মস্তিষ্কের প্রতি মুহূর্তেই প্রয়োজন অক্সিজেনযুক্ত রক্ত; এবং এই প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে হৃৎপিণ্ডকে অহোরাত্র যে পরিশ্রম করতে হয়, তার তুলনা নেই। প্রতি মিনিটে আধ সেরের চেয়েও বেশি রক্ত 'পাম্প্' করে সে; এবং স্বাভাবিক আয়ুবিশিষ্ট একজন মানুষের জীবনে পাম্প্ করে ৫৪৪৩৭ মণ রক্ত। বলা বাহুল্য, এই বিপুল পরিমাণ রক্ত ছোটখাটো একটি 'ড্যাম' বা জলাধার ভর্তি হবার পক্ষে যথেষ্ট। এ ছাড়া অবিরাম মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে হৃৎপিণ্ডকে এই রক্ত মস্তিষ্কের পথে ঠেলে দিতে হয়। ফলে প্রতিটি মানুষের হৃৎপিণ্ডই একদিন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে সংগ্রাম থেকে ছুটি নেয়। ছুটিটা চিরস্থায়ী হলে নিশ্চিন্ত; কিন্তু 'ক্যাজুয়েল' হলে মানুষের দুর্ভাগ্যের অন্ত থাকে না। তাকে মৃত্যুর শমন হাতে নিয়ে প্রতি মুহূর্তে পরলোকে হাজিরা দেবার প্রহর গুণতে হয়।

অতএব দেখছি, সব কিছু সমস্যার মূলে মাধ্যাকর্ষণ। এরই জন্যে বিবর্তনের পথ ধরে মানুষের উন্নতিটা ধীরে ধীরে হচ্ছে। এরই জন্যে হাজার চেষ্টা করেও মানববুদ্ধি অগ্রগতির ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারছে না।

এদিকে চাঁদ-বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই লক্ষ্যে পৌঁছুবার ব্রহ্মাস্ত্র আমাদের হাতে; এবং সে অস্ত্রটি হল চাঁদ। সেখানে একবার যেতে পারলে এতকালের বিদঘুটে একটা সমস্যার অনেকখানি সমাধান হবে; মাধ্যাকর্ষণের কবল থেকে অনেকটা মুক্তি পাবে মানুষ। কারণ, চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মাধ্যাকর্ষণ কম বলেই সে দেশে গিয়ে হৃৎপিণ্ড পৃথিবীর তুলনায় অনেক স্বল্প পরিশ্রমে রক্ত-সঞ্চালনের কাজ করবে ; এবং পরিশ্রম কম হবে বলে কার্যকাল বাড়বে তার। আর সেই সঙ্গে বাড়বে মানুষের জীবনসীমা।

এই জীবনসীমার ওপর অনেকেই গুরুত্ব আরোপ করেন। অনেককেই বলতে শোনা যায়, পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণের শাসনে মানুষের জীবন এমনভাবে বিপর্যস্ত যে জীবনের সবটুকু সে কাজে লাগাতে পারে না। বিচার-বুদ্ধির দিক দিয়ে পরিপক্বতা অর্জন করতেই তার জীবনের প্রথম কুড়িটি বছর পেরিয়ে যায়। পরবর্তী ৩০—৪০টি বছর মানবজীবনের ফলপ্রসূ কাল। তার বিচার-বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ এই সময়ের মধ্যেই হয় ; এবং এর পর থেকেই তার মস্তিষ্ক ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। কারণ মস্তিষ্ককে সতেজ রাখতে গেলে দেহের যে অংশগুলো কর্মক্ষম থাকা দরকার, সেগুলো ধীরে ধীরে তখন নিস্তেজ হয়ে যায়।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, চাঁদে গেলে মানব-মস্তিষ্কের এই নিস্তেজ অবস্থাকে অনেকদিন অবধি ঠেকিয়ে রাখা যেতে পারে। মাধ্যাকর্ষণ কম বলে সেখানে মানব-জীবনের ফলপ্রসূ কালটিকে বাড়ানো যেতে পারে পৃথিবীর দুই-তিন গুণ ; এবং এটা করা নিশ্চয়ই সম্ভবপর বলে চাঁদ একদিন বুদ্ধিজীবীদের স্বর্গে পরিণত হবে। একদিন দীর্ঘায়ু ভাগ্যবানরা বাস করবেন সেখানে। মার্তণ্ডদেবের অকৃপণ আশীর্বাদে রোগ সংক্রমণের হাত থেকে তাঁরা রক্ষা পাবেন। তাঁদের জন্যে কৃত্রিম উপায়ে জল উৎপাদিত হবে, বায়ু সংগৃহীত হবে। এ ছাড়া তাঁদের খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবস্থাও যে কৃত্রিম উপায়ে সারতে হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সন্দেহ শুধু একটি বিষয়ে ; এবং সে বিষয়টি হল কসমিক রশ্মির সঙ্গে মানবদেহের সৃষ্টি ও

বিকাশের সম্পর্ক। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল কসমিক রশ্মির অনেকটাই প্রতিহত করে; আর মানবদেহের বিবর্তন যে বিশ্বলোক থেকে আগত রশ্মির বিকিরণের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। জীববিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীর বিবর্তনলীলায় এই রশ্মির এক বিরাট ভূমিকা আছে।

এদিকে চাঁদে বাতাস নেই। অর্থাৎ, মহাজাগতিক রশ্মিকে প্রতিহত করবার মতো কোনো শক্তি সেখানে অনুপস্থিত। তাই সন্দেহ হয়, চাঁদে বাস করতে গিয়ে মানুষ তার আকৃতি-প্রকৃতির মধ্যে অদ্ভুত কোনো পরিবর্তন ডেকে আনবে না তো? পর্বত শেষকালে মূষিক-প্রসব করবে না তো?

অতি উৎসাহীরা এসব প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে চমৎকার যুক্তি আওড়ান। ওঁরা বলেন, পরের কথা পরে হবে। আগে তো আত্মরক্ষার আধার হিসেবে উপগ্রহটিকে কাজে লাগানো যাক। পৃথিবীতে পারমাণবিক যুদ্ধ লাগার আশঙ্কা আছে বলে আগে থাকতেই পালাবার পথটিকে তো খোলা রাখা যাক।

আমরা বলি, চমৎকার! বলি, পৃথিবীকে মহাশ্মশানে পরিণত করে ওদের পলায়নের দৃশ্যটা দেখবার মতো হবে নিশ্চয়। কিন্তু তবু একটা সংশয় চিরকাল থেকে যাবে। চাঁদে গিয়েই কি ওঁরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন? পৃথিবীতে যুদ্ধের যে স্বাদ পেয়েছেন ওঁরা, চাঁদে গিয়ে তা কি পুরোপুরি ভুলে থাকা সম্ভব?

আশঙ্কা হয়, সম্ভব হয়তো হবে না। চাঁদে গিয়েও আবার যুদ্ধের আগুন জ্বালবেন ওঁরা। আবার পথ খুঁজবেন অন্য কোন নতুন স্বর্গের। কিন্তু সেদিন তেজস্ক্রিয় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন পৃথিবীর দিকে নিশ্চয় চোখ পড়বে ওঁদের। নিশ্চয় ওঁরা ভাববেন, বড় ভুল করেছি। নিজের ঘরে আগুন লাগানো ঠিক হয় নি।

চাঁদের কাছাকাছি

ঘরে আগুন এখনও অবশ্যি পুরোপুরি লাগে নি ; এবং লাগে নি বলেই এখনও প্রশ্ন করতে শোনা যায় অনেককে, গল্প কি কখনও সত্যি হয় ?

—হ্যাঁ, হয়। অনেকেই জবাব দেন।

—ফ্যান্‌টাসী ?

—হ্যাঁ, তাও সত্যি হয়।

মানুষ এই সেদিন জবাব দিয়েছে,—হ্যাঁ, তাও হয় সত্যি। সত্যি যদি না-ই হবে তো জুলে ভার্ন-এর গল্পটা বাস্তবের সঙ্গে অমন মিলে যাবে কেন ? কেন ১৮৬৫-তে লেখা তাঁর সায়ান্স্‌-ফ্যানটাসী 'ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন অ্যাণ্ড এ ট্রিপ্‌ রাউণ্ড ইট্‌' ১৯৬৮-তে অমন সত্যি হয়ে উঠবে ? আর কেনই বা চাঁদের একেবারে কাছাকাছি থেকে আদ্যিকালের সেই প্রতিবেশী-উপগ্রহকে প্রদক্ষিণ করবে মানুষ ?

একবার নয়, চাঁদকে দশবার প্রদক্ষিণ করল সে এবং মাত্র ৬০—৭০ মাইল দূর থেকে প্রতিবেশীর চারদিকে ঘুরপাক খেতে খেতে মানববুদ্ধির নবজন্মের খবরটা সে যীশুখ্রীস্টের জন্মদিনে প্রচার করল।

কিন্তু হায় জন্মদিন ! আর হায় যীশুখ্রীস্ট !—বলছেন কেউ কেউ ! পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন রুগ্ন ও বুভুক্ষু, তখন চাঁদে-পাড়ির জন্যে এই রাজসূয় আয়োজনটা কতখানি খ্রীস্ট-আদর্শ-অনুমোদিত, তা' নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলছেন। কেউ কেউ আবার বলছেন, ওসব বাগ্‌বিতণ্ডা থাক এখন। এখন বরং চাঁদের দেশের নতুন খবর নেয়া যাক।

আমরা বলি, বেশ! যাক নেয়া। খ্রীস্টের জন্মদিনকে ঘিরে চাঁদ-উৎসব ১৯৬৮-তে আমরা কিভাবে পালন করেছি, তা' একটু তলিয়ে দেখা যাক।

তলিয়ে দেখতে গিয়ে আসুন, রাজসূয়ের সেই যজ্ঞভূমিতে যাই আমরা। আমরা যাই সেই কেপ কেনেডিতে যেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ সবচেয়ে সেরা তিনজন মহাকাশচারীকে দিয়ে চাঁদকে সেলাম দেয়াবে বলে পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল পরিকল্পনার একটি পুণ্যফল এ্যাপোলো-৮কে হাজির করেছে।

হ্যাঁ, এ্যাপোলো-৮ হাজির। হাজির সেটার্ন সি-ফাইভ্ রকেট। ১৯৬৮-র ২১শে ডিসেম্বর ফ্লোরিডার কেপ কেনেডী লোকে লোকারণ্য।

হাজার হাজার লোক অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে ওখানে। ওখানে সবাই একটিই প্রশ্ন করছে, ওঁরা কি তৈরী?

—হ্যাঁ, তৈরী ওঁরা; কণ্ট্রোল রুম থেকে এক সময় ঘোষণা করা হয়,—হ্যাঁ, ওঁরা তিনজন নভশ্চর এয়ার-ফোর্স-কর্নেল বোরম্যান নেভি-ক্যাপ্টেন জেমস্ লোভেল এবং এয়ার-ফোর্স-মেজর উইলিয়াম এ্যাণ্ডার্স চাঁদে পাড়ি দেবার জন্যে এখন তৈরী।

—স্টার্ট! কণ্ট্রোল রুমে থেকে নির্দেশ ভেসে আসে ঠিক সকাল পৌনে আটটায়। আর সঙ্গে সঙ্গেই রাক্ষুসে একটা হাউই-এর মতো আকাশের দিকে হাত বাড়ায় এ্যাপোলো-৮। তিনটি রকেট (অথবা বলা যায়, একটি রকেটেরই তিনটি অংশ) মাত্র আড়াই মিনিটের মধ্যে তাকে পৃথিবী থেকে ৩৮ মাইল উঁচুতে ঠেলে দেয়।

প্রথম রকেটের পাঁচটি ইঞ্জিনের কাজ শেষ হয় এবার।

ইঞ্জিনগুলো এবার আপনার থেকেই খুলে পড়ে যায়। আর মহাকাশযানটি ছুটতে থাকে ঘণ্টায় ৬,০০০ মাইল বেগে।

এবার দ্বিতীয় রকেটের পাল্লায়। পাঁচটি ইঞ্জিনকে ছ মিনিটের মধ্যে জ্বালিয়ে দিয়ে সে-ও দেখতে দেখতে নিঃশেষিত হয়ে যায়। আর মহাকাশযানটি উঠে আসে পৃথিবী থেকে ১১৮ মাইল ওপরে। এতক্ষণে তার গতিবেগ দাঁড়িয়েছে ঘণ্টায় ১৪ হাজার মাইলেরও বেশি।

তৃতীয় রকেট কাজ সুরু করে এবার। অ্যাপোলো-৮ অস্থায়ী একটি কক্ষপথে এবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে সুরু করে। এই হল 'পার্কিং প্ল্যাটফর্ম'। এ-ধরে প্রায় দুবার পৃথিবী-প্রদক্ষিণের পর অ্যাপোলো-৮ চাঁদের দিকে এগোয়। ঘণ্টায় প্রায় ২৫ হাজার মাইল বেগে অসীম-অনন্ত মহাকাশের বুকে ছুটে চলে সে। সেটার্ন-রকেটের তৃতীয় পর্যায়ের ইঞ্জিন তাকে চলার রসদ যোগায়।

এতক্ষণে আড়াই ঘণ্টা কেটে গেছে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে কাটিয়ে এতক্ষণে সত্যিকারের চাঁদমুখী হয়েছে অ্যাপোলো-৮।

অ্যাপোলো-৮ ঠিক পথ ধরেই চলে; এবং সে-পথটা পূর্ব-পরিকল্পিত পথের সঙ্গে এমন হুবহু মিলে যায় যে, জোর করে তার দিক্-পরিবর্তনের প্রশ্ন আদৌ আর ওঠে না।

নভশ্চররা নিশ্চিন্ত এখন। নিশ্চিন্তমনে ওঁরা এখন পৃথিবী থেকে ৬২,৫০০ মাইল দূর দিয়ে যেতে যেতে রকেটের প্রধান মোটরটিকে সক্রিয় করে তোলেন।

২২শে ডিসেম্বর ভারতীয় সময় ভোর পাঁচটা নাগাদ পৃথিবী থেকে ওঁদের দূরত্ব দাঁড়ায় এক লক্ষ মাইল। চাঁদ-প্রদক্ষিণ সুরু করতে হলে আরও এক লক্ষ ২৩ হাজার ৩৩৭ মাইল যেতে হবে ওঁদের।

কিন্তু যেতে ওঁরা পারবেন কি? চাঁদের অর্ধেক পথ যেতে না যেতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন দু'জন নভশ্চর। বোরম্যান জানান, পেটের গোলমাল দেখা দিয়েছে তাঁর; গা বমি-বমি করছে। আর এ্যাণ্ডার্স জানান, জ্বর আসছে তাঁর, সারা শরীরে কেমন যেন কাঁপুনি ধরছে।

খবর শুনে পৃথিবীর কণ্ট্রোল রুম থেকে দাওয়াই বাৎলানো হয় অচিরেই; এবং ভাগ্য ভালো, সে দাওয়াই খেয়ে অচিরেই নভশ্চররা সেরে ওঠেন।

এদিকে দেখতে দেখতে নতুন খবর আসে পৃথিবীতে। লোভেল জানান, চাঁদকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে; ঠিক যেন ফিকে নীল রঙের মনে হচ্ছে তাকে।

কিন্তু ওই নীল রহস্যপুরীর খুব কাছাকাছি যেতে পারবেন তো ওঁরা? গিয়ে, ওকে প্রদক্ষিণ করে পৃথিবীতে ফিরে আসা অবধি মোট ৪ লক্ষ ৮০ হাজার মাইল পথ নির্বিঘ্নে ওঁরা পাড়ি দিতে পারবেন তো?—

পৃথিবীর অনেক মানুষেরই তখন মাথায় হাত। তখনও অনেককেই কানাঘুঁষো করতে শোনা যাচ্ছে,—যন্ত্র যদি বিশ্বাস-ঘাতকতা করে? যদি চাঁদের দেশে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েন ওঁরা? অথবা যদি ওঁরা অনন্ত মহাশূন্যে চিরকালের মতো হারিয়ে যান?

না, হারিয়ে ওঁরা যাবেন না। বিজ্ঞানবিদ্যায় বিশ্বাসীরা টেলিভিসনের সামনে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা দেন, ওই যে! দেখুন না, গতি কমে আসছে ওঁদের। ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল বেগে ওঁরা ছুটেছিলেন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ থেকে ছাড়া পাবেন বলে। কিন্তু এখন ওঁরা ছুটছেন ঘণ্টায় মাত্র তিন হাজার মাইল বেগে। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের আওতায় আসবার আগে ওঁরা অবিশ্যি আরও কিছুটা

জোরে ছুটবেন। তখন ঘণ্টায় পাঁচ হাজার মাইল গতিবেগ হবে ওঁদের।

—তা' হবে। হয়তো ঠিক সফল হবেন ওঁরা। ২৩শে ডিসেম্বর অনেককেই বলতে শোনা যায়।

ওদিকে ওই বিশেষ দিনটিতেই মহাকাশযান থেকে নতুন খবর আসে। মহাকাশচারীরা জানান, চাঁদের মাধ্যাকর্ষণবৃত্তের দিকে এগিয়ে চলেছেন। ওঁরা সুস্থ শরীরে প্রতিবেশী-উপগ্রহের দিকে এগোচ্ছেন।

—পৃথিবী থেকে আমাদের দূরত্ব এখন ১ লক্ষ ৮০ হাজার মাইল, বলেন ফ্রাঙ্ক বোরম্যান।

তিনি আরও বলেন, আগামীকালের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছি আমরা। আমরা তাকিয়ে আছি সেই শুভ মুহূর্তটির দিকে যখন চাঁদ থেকে আমাদের দূরত্ব দাঁড়াবে মাত্র ৬০ মাইল।

শুভ মুহূর্ত জুলে ভার্ন-এর গল্পের মতো এগিয়ে আসে যেন। ২৪শে ডিসেম্বর ভারতীয় সময় রাত ১টা ৫৯ মিনিটে বোরম্যান, লোভেল ও এ্যাণ্ডার্স চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ-বৃত্তের মধ্যে পৌঁছান।

মানব-সভ্যতার ইতিহাসে নতুন একটি দিগন্ত উন্মোচিত হয় এবার। কারণ, এবার থেকে মানুষ বলতে পারবে, পৃথিবী ছাড়াও সৌরজগতের অন্য একটি শরিকের আকর্ষণ বা টান আমরা অনুভব করেছিলাম।

এদিকে চাঁদের টানে অ্যাপোলো—৮-এর গতিবেগ বাড়তে থাকে। নভশ্চররা অপেক্ষাকৃত দ্রুত এগোতে থাকেন এবার।

রকেট-ইঞ্জিনকে হঠাৎ প্রজ্বলিত করে এবার সুরু হয় ওঁদের চাঁদ-প্রদক্ষিণ।

কিন্তু প্রদক্ষিণ-সুরুর মুহূর্তে পৃথিবীর কিছু বন্ধুর চুল খাড়া হয়ে

উঠেছিল। যতক্ষণ অবধি চাঁদের আড়ালকরা দিকটিতে ছিলেন ওঁরা, ততক্ষণ পৃথিবীর কণ্ট্রোল রুমের সঙ্গে ওঁদের কোনো যোগাযোগ ছিল না।

যোগাযোগ নতুন করে স্থাপিত হয় ২৪শে ডিসেম্বর, ভারতীয় সময় ৩টে ৫৫ মিনিটে। ওই বিশেষ সময়টিতেই পৃথিবীর কিছু চাঁদ-বিশেষজ্ঞকে নিশ্চিত হয়ে বলতে শোনা যায়, আমরা পেয়েছি। চাঁদ-প্রদক্ষিণরত অ্যাপোলো-৮তে খুঁজে পেয়েছি আমরা!

—খুঁজে আমরাও পেয়েছি। আমরা খুঁজে পেয়েছি পৃথিবীকে, অ্যাপোলো-৮ থেকে জবাব আসে।

বোরম্যান জানান, চাঁদের আড়াল-করা দিকটিতে থাকবার সময় প্রধান রকেটটিকে পূর্ব-পরিকল্পনা-মাফিকই কাজে লাগিয়েছি আমরা। এমনভাবে ওকে প্রজ্বলিত করেছি, যা'তে অ্যাপোলো-৮-এর গতিবেগ কমে আসে এবং চাঁদ সুযোগ পায় তার মাধ্যাকর্ষণের আওতার মধ্যে অ্যাপোলোকে টেনে নিয়ে ওকে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৌঁছে দিতে।

শেষ অবধি সে পৌঁছে দেয় ঠিক। চাঁদ তার সম্পর্কে মানুষের প্রত্যাশা অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করে। অ্যাপোলো-৮ যখন চাঁদের আড়াল-করা দিকটি থেকে বেরিয়ে আসে তখন দেখা যায়, নভশ্চররা প্রত্যাশিত উপবৃত্তাকার একটি পথ ধরেই প্রতিবেশী-উপগ্রহকে প্রদক্ষিণ করছেন। আড়াল-করা দিকটিতে থাকবার সময় অ্যাপোলো-৮-এর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৯,৩৩৪ কিলোমিটার। কিন্তু এখন তা' কমে গিয়ে ৫,৯৪৪ কিলোমিটারে দাঁড়িয়েছে। চাঁদকে নির্দিষ্ট একটি কক্ষপথ ধরে প্রদক্ষিণ করতে গেলে ঠিক এই গতিবেগই দরকার।

—আমাদের দিকে লক্ষ্য রাখুন এখন, বোরম্যান চাঁদ-প্রদক্ষিণ করতে করতে পৃথিবীতে খবর পাঠালেন।

পৃথিবীর মানুষ জবাব দিল, লক্ষ্য রাখছি। আপনাদের মহাকাশ-যানটিকে চাঁদের কিনারা থেকে বেরিয়ে-আসা একটি বিন্দুর মতো দেখছি আমরা।

বিন্দুই বটে; এবং সে বিন্দুটি তার কক্ষপথে ঠিক ১২ ডিগ্রী হেলে থাকে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মহাকাশযান এইভাবে হেলান দিয়ে চাঁদ-প্রদক্ষিণ না করলে চাঁদে নামবার উপযুক্ত স্থানগুলো বেছে নেওয়া কঠিন হবে।

ওদিকে চাঁদে নামবার স্থানগুলো খুঁজে বেড়ান নভশ্চররা। শেষ পর্যন্ত একটি বৃত্তাকার পথে মহাকাশযানটিকে স্থাপন করে ওঁরা চাঁদ-প্রদক্ষিণ স্থরু করেন মাত্র ৬৯ মাইল দূরে থেকে। ২০ ঘণ্টায় মোট দশবার চাঁদ প্রদক্ষিণ করেন ওঁরা এবং প্রদক্ষিণ করতে করতে চাঁদের পাহাড়-পর্বত ও 'ক্রেইট্যার'গুলোর আশ্চর্য-স্থন্দর সব ছবি তোলেন।

চাঁদকে কেমন দেখায়?

নভশ্চররা বলছেন, দেখায় প্লাস্টার অব্ প্যারিস-এর মতো, ধূসর রঙের বালির মতো। কোথাও আবার বিপজ্জনক মনে হয় চাঁদের ভূখণ্ডকে। মনে হয়, বহুবর্ণে চিত্র-বিচিত্র মার্বেল দিয়ে যেন সে দেশটার কোনো কোনো জায়গা মোড়া। তবে সবদিক মিলিয়ে দেখলে সন্দেহ থাকে না যে, বিশেষ কোনো রঙ্ নেই চাঁদের বেশির ভাগ জায়গারই। ধূসরের সঙ্গে সাদা সেসব জায়গায় এমনভাবে মিশে আছে যে, বার বার দেখেও ঠাওর করা যায় না, কী বলবো চাঁদকে!—ধূসর? না সাদা? না কি রঙ্হীন?

এ্যাণ্ডার্স রিপোর্ট পাঠালেন,—যাই বলি না কেন, চাঁদকে যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমরা, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কোনো সন্দেহই নেই যে, চাঁদের বহুকথিত জায়গাগুলো আমাদের চোখের সামনে দিয়ে ছায়াছবির মতো চলে যাচ্ছে।

—ওই তো! ২৫শে ডিসেম্বরের সুরুতেই জানিয়ে দিলেন এ্যাণ্ডার্স, ওই তো সেই বিখ্যাত 'ক্রেইট্যার' কলম্বো। আর ওই তো গুটেনবার্গ। খুব ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছি ওদের। দেখতে পাচ্ছি, ক্রেইট্যার-এ সমাচ্ছন্ন চাঁদের উপত্যকা আর গাছপালাহীন চাঁদের পাহাড়-পর্বত।

—কিন্তু পাহাড়-পর্বত নয়, অগুনতি ক্রেইট্যার্ দেখেই স্তম্ভিত হচ্ছি আমি, জানালেন লোভেল। বললেন, আমি মুগ্ধ হচ্ছি দেখে যে, ক্রেইট্যারগুলোর প্রায় সবই বৃত্তাকার। আমার মনে হয়, উল্কা-জাতীয় কোনো পদার্থের সঙ্গে চাঁদের সংঘর্ষের ফলেই এদের সৃষ্টি হয়েছে।

লোভেল আরও বললেন, ক্রেইট্যার-এর চারিদিকে যে পাথুরে দেওয়ালগুলো আছে, তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো। তাদের দিকে তাকালে ওপর থেকে নিচে অবধি মোট ছ'-সাতটি সারি চোখে পড়ে। অবিশ্যি এমন ক্রেইট্যার্ও চাঁদে অনেক আছে যাদের মাঝখানটা দেখতে উঁচুমতো।

এদিকে দেখতে দেখতে মহাকাশযান চাঁদের 'সী অব্ ফার্টিলিটি'র ওপর এসে পড়ে। লোভেল দেখতে পান, ওখানকার একটি ক্রেইট্যার্ থেকে রশ্মি বেরিয়ে আসছে।

এ্যাণ্ডার্স দেখেন, পৃথিবী থেকে যে পরিমাণ প্রতিফলিত-আলোক চাঁদ পায় বলে তাঁর ধারণা ছিল, তা' ঠিক। ঠিকই অনেকটা আলোক পায় চাঁদ; এবং পায় বলেই তার ক্রেইট্যার-গুলোকে স্পষ্ট দেখায়।

—স্পষ্ট দেখাচ্ছে চাঁদের তিন কোণা পাহাড়গুলোকেও,—

লোভেল জানিয়ে দেন এক সুযোগে। বলেন, চাঁদের আড়াল-করা দিকটিকেও ভালোভাবে দেখে নিয়েছি আমরা ; এবং আমার মনে হয়, আমাদের এই অভিজ্ঞতা থেকে বিজ্ঞানীদের বহুকালের বহু জিজ্ঞাসার জবাব মিলবে।

—তা' তো মিলবেই, পৃথিবীতে বসে আমরা কানাঘুষো করি। বলি, চাঁদের দেশের ক্রেইট্যার্‌গুলো কী করে সৃষ্টি হল, তা হয়তো এতদিনে জানা যাবে। আর জানা যাবে চাঁদের ধূলোয়-ভরা সাগরগুলোর রহস্য।

—কিন্তু চাঁদে তো বাতাস নেই। অতএব এত ধূলো কোত্থেকে এল ?—বলাবলি করেন অনেকেই।

এদিকে অনেকেই আবার চাঁদের দেশের নতুন খবরের জন্যে কান পাতেন।

খবর আসে ঠিক। নভশ্চররা জানান, আমরা এখন চাঁদের 'সী অব্ ক্রাইসিস্'-এর ওপর দিয়ে চলেছি। 'ক্রাইসিস্'-এর বেশির ভাগ অঞ্চল সমতল এবং ঘোর রঙের। কিন্তু তার কিনারাগুলো একটু যেন উজ্জ্বল। যেন দেখলেই মনে হয়, কোনো কিছুর সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে সম্প্রতি ওদের সৃষ্টি হয়েছে।

এ্যাণ্ডার্স জানান, এখন যে অঞ্চলটা দেখছি, তা সম্ভবত বহুকালের পুরোনো একটি স্তব্ধ লাভাস্রোত, কিন্তু সব কিছু খুব ভালো দেখতে পাচ্ছি না এখন। চাঁদের দেশের প্রতিফলিত-আলোক এখন আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

লোভেল জানান, এখন আমরা প্রতীক্ষা করে আছি চাঁদের সেই অঞ্চলটির জন্যে, যাকে বলা হয় 'টারমিনেট্যার'। যেখানে চাঁদের আঁধার-রাজ্যের শেষ এবং আলোক-রাজ্যের সুরু। ওই বিশেষ রাজ্যটিতেই চাঁদের পাহাড়-পর্বতগুলোর দীর্ঘ ছায়া

পড়বে ; এবং পড়বে বলেই ওদের চিনে নিতে সুবিধে হবে আমাদের।

—চাঁদে সূর্যোদয় ভারি সুন্দর! লোভেল জানিয়ে দেন একবার। বলেন, ওদেশে যেখানটায় সূর্য ওঠে, শুধুমাত্র সেখানটাই আলোকিত হয়ে ওঠে দেখতে দেখতে। বাতাস নেই বলে আলোক ওখানে পৃথিবীর সূর্যোদয়ের মতো ছড়িয়ে পড়ে না। ওখানে সূর্য একটু দূরে সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আলোকিত জায়গাটা ঘন আঁধারে ডুব দেয়।

এই আঁধার আলোর খেলা দেখতে দেখতে চন্দ্র-প্রদক্ষিণের সময় শেষ হয়ে আসে। মহাকাশযান সাফল্যের সঙ্গে নবমবার চাঁদ-পরিক্রমা শেষ করে। এই পরিক্রমার পথটা প্রতিবেশী-উপগ্রহের খুব কাছে আসে যখন, প্রতিবেশী থেকে তখন তার দূরত্ব দাঁড়ায় প্রায় ৫৯ মাইল ; আর যখন খুব দূরে যায়, তখন এই দূরত্ব গিয়ে ৬৩ মাইলে ঠেকে।

আর মাত্র একবার। দশম বার চাঁদ-প্রদক্ষিণ সুরু হয় এবার। এবং এই প্রদক্ষিণ-পর্ব শেষ হতে না হতেই নভশ্চররা তাঁদের রকেটের প্রধান ইঞ্জিনকে প্রজ্বলিত করেন। ১৯৬৮ সালের ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে ভারতীয় সময় সকাল ১১টা ৪০ মিনিটে পৃথিবীর দিকে ফিরে আসতে সুরু করেন ওঁরা। চাঁদ তখন পৃথিবী থেকে ২ লক্ষ ৩২ হাজার মাইল দূরে।

অবিশ্যি দূরত্ব এর চেয়েও বেশি অতিক্রম করতে হবে নভশ্চরদের। কারণ পৃথিবীতে একেবারে সোজা রাস্তায় ফিরে আসবেন না ওঁরা। চাঁদ ও পৃথিবী দুই-ই চলনশীল বলে ওঁদের আসতে হবে একটু ঘুরে। ঘুর-পথে পরিকল্পনা-অনুযায়ীই এগোন ওঁরা। পৃথিবী ছাড়ার ৯৯ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট পরে কেপ কেনেডীর সঙ্গে ওঁদের দূরত্ব দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৫২৯ মাইল।

পৃথিবীর হিসেবে নভশ্চরদের গতি এখন ঘণ্টায় ২ হাজার ৮১৬ মাইল। ওঁরা এখন মহাশূন্যের সেই কল্পিত 'কস্‌মিক্‌-প্রাচীর'-এর দিকে এগিয়ে আসছেন যেখানে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণকে প্রতিহত করবে এবং যেখান থেকে পৃথিবীর দিকে অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসবে অ্যাপোলো-৮।

অ্যাপোলো-৮ এগোয় ঠিক। যখন চাঁদ ও পৃথিবীর মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছয় সে, অর্থাৎ যখন পৌঁছয় পৃথিবী থেকে ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৬২৫ মাইল দূরে, তখন তার গতিবেগ দাঁড়ায় ঘণ্টায় ৪ হাজার মাইল।

নির্দিষ্ট পথ ধরে নির্বিঘ্নেই এগিয়ে আসে অ্যাপোলো-৮; এবং সে পথ এত নিখুঁত যে ফেরবার পথে অ্যাপোলোকে আর নতুন করে দিক-পরিবর্তন করতে হয় না।

—তারার সাহায্যে দিক্‌-নির্ণয় নির্বিঘ্নেই করে চলেছি আমরা; এবং ২৬শে ডিসেম্বরও আমাদের নির্বিঘ্নেই কেটে গেল,—নভশ্চররা জানান।

২৭শে ডিসেম্বর মাঝরাত্রি থেকে পৃথিবীতে অনেকেরই ঘুম নেই চোখে। অনেককেই তখন বলতে শোনা যাচ্ছে, নভশ্চররা আজ ফিরে আসবেন।

ওঁরা ফিরলেন ঠিক। ২৭শে ডিসেম্বর ভারতীয় সময় রাত ৯টা ২১ মিনিটে ওঁরা প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে নেমে এলেন।

প্রশান্তের হাওয়াইয়ে সূর্যোদয় হয় নি তখনও। তখনও প্রদোষের আঁধারে সে অঞ্চলটা আচ্ছন্ন। আর নভশ্চররা আচ্ছন্ন বিগত কয়েকদিন ধরে যে মহানাটক ওঁরা অভিনয় করেছেন, তারই স্মৃতিতে।

নাটকটা পৃথিবীতে নেমে আসবার কয়েক ঘণ্টা আগে থেকেই সবচেয়ে বেশি জমে উঠেছিল।

২৭শে ডিসেম্বর ভারতীয় সময় সন্ধ্যে ৫টা ৫৪ মিনিটে পৃথিবী থেকে ৩১ হাজার ৪০ মাইল দূরে পৌঁছয় অ্যাপোলো-৮। তখনও দুরন্ত গতিতে চলছে সে। এবং তখন তাকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢুকবার উপযোগী করবার জন্যে প্রস্তুতি চলছে।

প্রস্তুতি হিসেবে ভারতীয় সময় রাত ৮টা ৫৩ মিনিটে অ্যাপোলোর রকেট ইঞ্জিন, বাড়তি অক্সিজেনের আধার এবং বিদ্যুৎ তৈরির সেল ইত্যাদি ফেলে দেওয়া হল। অর্থাৎ, ব্যবস্থা হ'ল, মহাকাশে অ্যাপোলোর ফিরে-যাবার পথকে রুদ্ধ করার।

ওদিকে কন্ট্রোল রুমের কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শের পর নভশ্চররা স্থির করলেন, বায়ুমণ্ডলে ঢুকবার সময় অ্যাপোলোর তেরচা প্রবেশ-পথের কোনরকম পরিবর্তন প্রয়োজন হবে না। কিন্তু প্রয়োজন হবে তার তলদেশের তাপ-প্রতিরোধক প্রধান আবরণটিকে ছোট ছোট ইঞ্জিনের সাহায্যে বায়ুস্তরের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার।

যথাসময়ে আবরণটিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হল এবং ভারতীয় সময় রাত ৯টা ৭ মিনিটে অ্যাপোলো-৮ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করল।

বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অ্যাপোলোর তাপ-নিরোধক আবরণটির তাপমাত্রা ৩,৩০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ছাড়িয়ে গেল এবং পৃথিবীর কন্ট্রোল-রুমের সঙ্গে নভশ্চরদের বেতারসংযোগ হল বিচ্ছিন্ন।

কিছুক্ষণের জন্যে এমন যে হবে, তা' আগে থাকতেই অনুমান করা হয়েছিল। অতএব, রাত ৯টা ১০ মিনিটে যখন নভশ্চরদের

সঙ্গে বেতার-সংযোগ স্থাপিত হল আবার, তখন বিশেষজ্ঞদের কেউই খুব একটা অবাক হন নি।

ওদিকে ভারতীয় সময় রাত ৯টা ১৫ মিনিটে মহাকাশযানের গতিহ্রাসকারী দু'টো প্যারাসুট আপনার থেকেই খুলে গেল এবং রাত ৯টা ২১ মিনিটে অ্যাপোলো-৮-এর ক্যাপস্যুলটি প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ইয়র্কটাউন জাহাজ থেকে মাত্র ৫ হাজার গজ দূরে নেমে এল।

অ্যাপোলো-৮-এর এই সাফল্যের ফলে মহাকাশ-পরিক্রমার ক্ষেত্রে কয়েকটি অভিনব রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে। এই রেকর্ডগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, এই সর্বপ্রথম পৃথিবীর মানুষ ঘণ্টায় ২৪ হাজার ১৭১ মাইল গতিবেগে পৃথিবীর অভিকর্ষের বন্ধন ছিন্ন করে কক্ষপথের বাইরে যেতে পেরেছে। মানুষ এই সর্বপ্রথম পৃথিবী থেকে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার মাইল দূরে পৌঁছে চাঁদ-প্রদক্ষিণ করেছে। এ ছাড়া চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের আওতায় এই সর্বপ্রথম এসেছে মানুষ; এই প্রথম সে চাঁদের অদৃশ্য অংশ স্বচক্ষে দেখেছে।

কিন্তু এত কিছু সাফল্য সত্ত্বেও হাউসটন-এর মহাকাশ-বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন তুলেছেন, চাঁদের মাটিতে সত্যি কবে পা দেবে মানুষ?

প্রশ্নটা উঠত না, যদি অ্যাপোলো-৮ দশবার ধরে চাঁদ-প্রদক্ষিণ করবার সময় তার নির্দিষ্ট কক্ষপথ থেকে একটু-আধটু সরে যেত।

কিন্তু কেন সরে গেল অ্যাপোলো-৮?

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, সরে গেল চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের হেরফেরের ফলে। চাঁদের দেশের জায়গায় জায়গায় আছে বিরাটকায় সব উল্কাখণ্ড। ওই সব উল্কায় লোহা এবং নিকেলের ছড়াছড়ি। আকৃতিতেও বিরাট ওরা। ওদের কোনো কোনোটির ব্যাস এমন

কি ৫০ মাইল। ওরা আছে চাঁদের পৃষ্ঠদেশে প্রোথিত হয়ে। অতএব, ওদের ধারে-কাছে পৌঁছুলে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের হেরফের তো হবেই।

কিন্তু হেরফের ঠিক কতটুকু হয়ে থাকে, চাঁদের দেশে ঠিক কী পরিমাণে আছে ওরা, তা' পুরোপুরি না জানলে চাঁদে অবতরণকারী মানুষের পক্ষে পৃথিবীতে ফিরে আসা কঠিন হবে।

এদিকে চাঁদে অবতরণের উদ্যোগ-আয়োজন অবিশ্যি পুরোদমেই চলছে। ১৯৬৯-এর মে-এর দিকে হয়েছে অ্যাপোলো-১০-এর অভিযান। অ্যাপোলো-৯ চাঁদে যায় নি; কিন্তু অ্যাপোলো-১০ তিনজন নভশ্চরকে নিয়ে চাঁদ থেকে ৫০ হাজার ফুট দূর অবধি গিয়ে পৃথিবীতে ফিরে এল আবার।

অ্যাপোলো-৯কে দিয়ে 'চান্দ্র তরণী' বা 'লুনার মডিউল' সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চললো। চান্দ্র তরণীটিকে মূল মহাকাশযান থেকে বিয়োজন করা হ'ল পৃথিবীর কক্ষপথে; এবং তারপর আবার এটিকে সংযোজন করা হ'ল মূল যানের সঙ্গে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 'চান্দ্র তরণী'র এই সংযোজন ও বিয়োজন চাঁদে পাড়ি দেবার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয়।

আমরা বিশ্বাস করি, কিছুদিনের মধ্যেই চাঁদে পাড়ি দেবে মানুষ। কিছুদিনের মধ্যেই সে গিয়ে দাঁড়াবে প্রতিবেশী উপগ্রহটির ওপর। কিন্তু প্রশ্ন, এইভাবে বিশ্বজগতের কতটুকু জানা সম্ভব? বিশ্বলোকের কতটা দূর অবধি পাড়ি দিতে পারবে আগামী কালের মানুষ? সূর্য একটি নয়, লক্ষ লক্ষ। গ্রহ কয়েকটি নয়, কোটি কোটি। লক্ষ লক্ষ সূর্যলোক আছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। সেই সব সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে লক্ষ লক্ষ গ্রহ। এমন সূর্যও অনেক আছে, যাদের আলো এখনও পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় নি।

আলো সেকেণ্ডে চলে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। আমাদের পরিচিত সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো পোঁছুতে সময় লাগে মাত্র সাড়ে আট মিনিট। অথচ সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব অল্প কিছু নয়, ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। যে সূর্য থেকে এখনও আলো এসে আমাদের কাছে পৌঁছয় নি, পৃথিবী থেকে তার দূরত্বটা কল্পনা করুন একবার। এদিকে রকেটকে যত জোরেই আমরা চালাই না কেন, আলোর চেয়ে বেশি গতিবেগ লাভ করা কোনোদিন আমাদের পক্ষে সম্ভব ময়। অতএব আমাদের পক্ষে বিশ্বজগৎকে পাড়ি দেওয়াও সম্ভব নয় কোনোদিন।

এইখানে মন্তব্য করেন কেউ কেউ। বলেন, সম্ভব তো আরও অনেক কিছুই নয়। মৃতকে জীবিত করা সম্ভব নয়; অমরত্ব লাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে মানুষ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে কেন!

আমরা বলি, ঠিক কথা। কেন বসে থাকবে।

আর বলি, মানুষ কোটি কোটি টাকা খরচ করে গ্রহে-গ্রহান্তরে ছোটাছুটি করার সময় তার চেনা-পৃথিবীর বুভুক্ষু ও রুগ্ন মানুষদের কথা যেন একেবারে ভুলে না যায়।

চাঁদে চললাম

আমরা চাঁদে চললাম। আমাদের অ্যাপোলো —১০ এই সেদিন মাত্র ১০ মাইল দূর থেকে চাঁদকে সেলাম জানিয়ে ফিরে এলো।

সেলাম জানাই আমরাও। চাঁদকে জানাই। অ্যাপোলো—১০কে জানাই। জানাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে।

ওই যুক্তরাষ্ট্রেরই একটি জায়গা ফ্লোরিডার কেপ কেনেডি পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রকেট স্যাটার্ন সি-ফাইভ-এর হেড্‌কোয়ার্টার।

ওখানে দাঁড়ালেই চোখে পড়ে সারি সারি মঞ্চ। রকেট-উৎক্ষেপণ মঞ্চ ওগুলো। ওদেরই একটি ৩৯ বি থেকে অভূতপূর্ব এক নাটকের অভিনয় স্থুরু হল সেদিন। স্যাটার্ন সি—ফাইভ্‌ অ্যাপোলো—১০কে নিয়ে আকাশে উঠলো।

একটা দৈত্য উঠলো যেন। ৩,১০০ টন ওজনের ৩৬৩ ফুট উঁচু একটা রাক্ষস উঠলো।

রাক্ষসটার ঘাড়ের কাছে বসে আছেন তিনজন অভিজ্ঞ মহাকাশচারী,—টমাস স্ট্যাফোর্ড, জন ইয়ং এবং ইউজিন সারনান।

স্ট্যাফোর্ডকে ঘিরে এর আগেও অনেক স্বপ্ন দেখেছে মানুষ। কারণ, তিনি ছিলেন ১৯৬৬ সালের এক বিস্ময় জেমিনি—৯ মহাকাশযানের চালক।

জেমিনি—৯-এর কীর্তি কী? না পৃথিবী-প্রদক্ষিণকারী চালকবিহীন একটি নিঃসঙ্গ মহাকাশযানের সঙ্গে মিলন।

এই মিলন ঘটিয়েছিলেন স্ট্যাফোর্ড। জেমিনি—৯কে তিন-তিনবার তিনি ওই চালকবিহীন মহাকাশযানের খুব কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। অথবা বলা যায়, মিলন ঘটিয়েছিলেন তার সঙ্গে।

পৃথিবীর মানুষরা সেদিন খুব জোর হাততালি দিয়েছিল। অনেকেই বলেছিল,—হ্যাঁ, স্ট্যাফোর্ডের পক্ষেই এটা সম্ভব। মহাকাশে উড়তে উড়তে ঠিক এমনিতরো কীর্তি তিনি এর আগেও একবার স্থাপন করেছিলেন। ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরে জেমিনি—৬-কে তিনিই নিয়ে গিয়েছিলেন জেমিনি—৭-এর ১ফুট মাত্র দূরে।

মহাশূন্যের বুকে ভেল্‌কিবাজিতে জন ইয়ংও অবিশ্যি কম যান না।

মহাকাশচারী হবার আগে থেকেই ভেল্‌কি দেখাতে সুরু করেন তিনি। একবার নৌবাহিনীর বিমানে চেপে ২৫,০০০ মিটার উঁচুতে উঠে রেকর্ড করেন।

কিন্তু এ-রেকর্ডটিও নেহাৎ খেলো হয়ে গেল দেখতে দেখতে। হল ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে, ইয়ং-এরই দৌলতে।

ইয়ং সেদিন নতুন এক ইতিহাস স্থাপন করেছিলেন। ভার্জিল আই গ্রীসম-এর সহায়তায় জেমিনি—৩ মহাকাশযানটিকে তিনি এক কক্ষপথ থেকে অন্য কক্ষপথে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এছাড়া এই ইয়ংই ছিলেন জেমিনি—১০ মহাকাশযানের চালক। জেমিনি—১০-কে চালকহীন একটি মহাকাশযানের দিকে চালিয়ে নিয়ে যান তিনি এবং তারপর সেই যানটিকে ছাড়িয়ে গিয়ে অন্য একটি যানের সঙ্গে মিলিত হন। এই মিলন-মুহূর্তে পৃথিবী থেকে ৪৭৫ মাইল উঁচুতে-ওঠার রেকর্ড-দূরত্বে ছিলেন ইয়ং।

মহাকাশচারণার ক্ষেত্রে কিছু রেকর্ড সারনান-এরও আছে। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে জেমিনি—৯ মহাকাশযানে তিনি ছিলেন

স্ট্যাফোর্ডের সহকারী। তিনি জেমিনি—৯ থেকে বেরিয়ে এসে ২ ঘণ্টা ৭ মিনিট মহাকাশে পদচারণা করেছিলেন; এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে তাঁর এই অভিনব পদচারণা আজও অবধি রেকর্ড হিসেবে গণ্য।

কিন্তু অ্যাপোলো—১০-এর উৎক্ষেপণের মুহূর্তে এ-রেকর্ডটিকে একেবারেই তুচ্ছ মনে হয় যেন সারনান-এর। সেই মুহূর্তে বারবার যেন তাঁর মনে হয়, দুজন সহযাত্রীকে নিয়ে নতুন যে রেকর্ড এবারে তিনি করতে চলেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তা' বুঝি অতুলনীয়।

সহযাত্রীরা পাশেই বসে আছেন তাঁর। দলের নেতা স্ট্যাফোর্ড বসে আছেন। আর বসে আছেন সহকারী পরিচালক ইয়ং। স্থির হয়েছে, স্ট্যাফোর্ড ও সারনান মূল মহাকাশযানটি থেকে নেমে এসে ছোট আর একটি মহাকাশযানে চেপে চাঁদের ১০ মাইলেরও কম দূরে পৌঁছে যাবেন।

—কিন্তু সত্যি কি পৌঁছুবেন ওঁরা ?—ফ্লোরিডার কেপ কেনেডিতে ১৮ই মে রবিবার এই একই প্রশ্ন সকলের মুখে। সকলেই স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন ৪৭ টন ওজনের অ্যাপোলো—১০-এর দিকে।

দু'-একজন আবার তাকাতে গিয়ে অন্যমনস্ক হন যেন একটু। ওঁদের মনে পড়ে যায় ২৭শে এপ্রিলের দুর্ঘটনার কথা। মনে পড়ে, ওই দিনটিতেই হাজার হাজার গ্যালন কেরোসিন ওই বিশেষ রকেটটি থেকে জ্বালানি-দুর্ঘটনার দরুণ পড়ে গিয়েছিল।

—সর্বনাশ! এমন দুর্ঘটনা আবার ঘটে যদি ?—অনেকেই ভাবলেন ঠিক সেই মুহূর্তে।

কিন্তু বেশি কিছু ভাবনার আর সময় কোথায়! মূর্তিমান

দানব স্যাটার্ন সি—ফাইভ্ অগ্নি-উদ্‌গিরণ সুরু করেছে এরই মধ্যে। প্রচণ্ড গর্জন সুরু করেছে।

এই গর্জন স্তব্ধ হয়ে আসে দেখতে দেখতে। কেপ কেনেডিতে অদ্ভুত এক নীরবতা ঘনিয়ে আসে। মাত্র ১৫০ সেকেণ্ডের মধ্যে প্রথম স্তরের রকেট মহাকাশযানটিকে ঘণ্টায় ৬ হাজার মাইল গতিসম্পন্ন করে ৩৮ মাইল উঁচুতে ঠেলে দেয়। প্রতি সেকেণ্ডে তখন রকেটটিতে ৩,৪০০ গ্যালন করে জ্বালানি খরচ হয় এবং ওই জ্বালানি থেকে যে ধাক্কার সৃষ্টি হয়, তা' হল ৭৫ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের সমান।

সারনান চিৎকার করে ওঠেন,—চমৎকার! চমৎকার এই উড়ে-চলা!

পরিচালক স্ট্যাফোর্ড বলেন,—আমরা ঠিক পথেই এগোচ্ছি।

ওদিকে এগোবার কাজে দ্বিতীয় স্তরের রকেট লাগে এবার। ৬ মিনিটের মধ্যে প্রায় ৫০০ টন তরল হাইড্রোজেন ও তরল অক্‌সিজেন পুড়িয়ে মহাকাশযানটিকে সে ঘণ্টায় ১৪ হাজার মাইল গতিতে ১১৪ মাইল উঁচুতে ঠেলে দেয়।

এইবার ঠেলবার পালা তৃতীয় স্তরের রকেটের। মহাকাশযানটির গতি বাড়িয়ে ঘণ্টায় ১৭,৫০০ মাইল করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানির যোগান এই বিশেষ স্তরটিকেই দিতে হয়।

যোগানের কাজ চলে ঠিক পূর্ব-পরিকল্পনা-মাফিক। ফলে, অ্যাপোলো—১০-কে নিয়ে স্যাটার্ন—৫ রকেট প্রায় ১১৫ মাইল উঁচুতে পৃথিবীর প্রায় বৃত্তাকার কক্ষপথে প্রবেশ করে।

কক্ষপথে প্রবেশের পরেও তৃতীয় স্তরের রকেটটিকে ত্যাগ করা হয় না। পুনরায় ব্যবহারের কথা ভেবে তাকে মূল মহাকাশযানের সঙ্গে সংযুক্ত রাখা হয়।

এদিকে তৃতীয় স্তরের রকেটকে আবার ব্যবহার-করার মাহেন্দ্র-লগ্ন অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে পড়ে। মহাকাশচারীরা উৎক্ষেপণের দু' ঘণ্টা পরে তার ইঞ্জিনটি চালু করেন আবার; এবং আবার রকেটটি জ্বলে ওঠে। এইবার সাড়ে পাঁচ মিনিটের জন্যে জ্বলে রকেট, আর তা'তেই মহাকাশযান ও রকেটের গতিবেগ বেড়ে গিয়ে ঘণ্টায় ২৪,৪০০ মাইলে দাঁড়ায়।

এই শেষোক্ত গতিবেগটা পৃথিবী থেকে ছুটি নেবার গতি। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার গতি।

অ্যাপোলো—১০ এই গতিতেই প্রায় নিখুঁতভাবে চাঁদের দিকে ছুটে চলে। শুধুমাত্র দু'টি ছোটো অভিযোগ আসে মহাকাশচারীদের কাছ থেকে। মাঝে মাঝে সামান্য ধপ্ ধপ্ শব্দে তাঁদের রাত্রের ঘুমের ব্যাঘাত হয়; আর জলের ক্লোরিনে তাঁদের মুখ পুড়ে যায়।

ক্লোরিন সম্বন্ধে সতর্ক হলেন মহাকাশচারীরা। কিন্তু শব্দটা? শব্দ ওঁদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটালো বারবার। এবং শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল, মহাকাশযানটিকে ধীরে ধীরে ঘোরায় যে রকেটগুলো, তারাই এই শব্দ করছে।

—এ নিয়ে ভাবনার কিছু নেই,—পৃথিবীর 'কণ্ট্রোল রুম্'-এ বসে বিজ্ঞানীরা আশ্বস্ত করতে চাইলেন অভিযাত্রীদের।

আর ওদিকে অভিযাত্রীদের নেতা স্ট্যাফোর্ড বললেন, ভাবছি না মোটেই। আমরা তিনজনই নিজেদের বিরাট মনে করছি।

—বিরাট তো বটেই,—পৃথিবীর 'কণ্ট্রোল রুম' থেকে বার বার গুঞ্জরিত হয়। আর টেলিভিশনে দূর মহাকাশ থেকে ভেসে আসে পৃথিবীর রঙিন সব ছবি।

দূর মহাকাশ থেকে পৃথিবীর রঙিন ছবি পাঠাবার আয়োজন এই প্রথম।

এই প্রথম টেলিভিশন-ক্যামেরায় সুইচ টিপে এ-ধরণের অদ্ভুত ছবি পাঠান মহাকাশচারীরা।

হ্যাঁ, ছবিগুলো অদ্ভুত সত্যি। সত্যি, ওগুলোর দিকে তাকালে পৃথিবীটাকে নিথর নিঃসীম কালো পটভূমিতে একটা বলের মতো মনে হয়। আর মনে হয়, বলটার গায়ে নীল, সবুজ, সাদা আর বাদামী কিছু রেখা দিয়ে কে যেন আঁকিবুকি করেছে।

এই আঁকিবুকি দেখেই একবার চিৎকার করে ওঠেন সারনান। বলেন,—এই, শোনো! আমার কাছে পৃথিবীটাকে বাসোপযোগী খুব সুন্দর একটা জায়গা বলে মনে হচ্ছে।

—মনে হচ্ছে অরেও কত কী! আরও কত কী যে দেখছি আমরা!—মহাকাশযানটির ভিতরে একটি মনিটর পর্দার সাহায্যে মহাকাশচারীরা পৃথিবীকে তাঁদের ক্যামেরার মধ্যে ধরেন এবং তাঁদের যাত্রার একটি ধারা-বিবরণী দেন।

এদিকে দেখতে দেখতে যাত্রাপথের অনেকদূর পেরিয়ে আসেন ওঁরা। ১৯শে মে ভারতীয় সময় রাত ন'টায় ওঁরা আসেন পৃথিবী থেকে ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৮০০ মাইল দূরে। মহাকাশযান তখন ঘণ্টায় ৩,৭৯০ মাইল বেগে ছুটছে।

এই গতিবেগটা কমে আসে ক্রমেই। আর ক্রমেই মহাকাশ-চারীরা পৃথিবী থেকে দূরে গিয়ে পৌঁছুন। এবার পৃথিবী থেকে তাঁদের দূরত্ব দাঁড়ায় ২ লক্ষ ১ হাজার ২৫০ মাইল। মহাকাশযানটি তখন ঘণ্টায় মাত্র ২,১০০ মাইল বেগে চলতে থাকে। বেগ এতটা কমে যাবার কারণ, উপরের দিকে উঠে পৃথিবী থেকে দূরে চলে যাবার সময় অন্য সব পদার্থের মতোই মহাকাশযানের উপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির প্রভাব ক্রমশ কমে গিয়েছিল।

কিন্তু চিরাচরিত মাধ্যাকর্ষণ কমলে কী হবে। প্রতিবেশী

উপগ্রহটির কাছাকাছি এগিয়ে যাবার ফলে মহাকাশযানটির উপর চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব বেড়ে চলে ক্রমেই, এবং ক্রমেই মহাকাশযানটির গতিবেগও আবার বাড়তে থাকে।

২১শে মে ভারতীয় সময় বেলা ১২টা ১০ মিনিটে মহাকাশচারীরা চাঁদের অভিকর্ষের মধ্যে প্রবেশ করেন।

এবার খানিকক্ষণ নিশ্চিন্ত। মহাকাশচারীরা খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিলেন এবার।

ঘুম থেকে জেগে স্ট্যাফোর্ড কথা বললেন প্রথম। ভূপৃষ্ঠের নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্রকে তিনি জানালেন, অ্যাপোলো-১০ মোটামুটি সুন্দরভাবেই কাজ করছে ; তবে দুটো মাত্র ছোটো অসুবিধে দেখা দিয়েছে ওতে। কম্যাণ্ড আর লুনার মডিউল-এর মধ্যে সংযোগ-স্থাপনকারী টানেলটির ভিতরে কিছু 'ইনস্যুলেটেড্' জিনিসপত্তর ঢিলে হয়ে পড়েছে, আর খাবার জলে কিছু কিছু বুদ্‌বুদ্ দেখা দিয়েছে। ওদের পেটব্যথা করছে সামান্য।

এই খবর শুনে ভূপৃষ্ঠের নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র থেকে এই অভিযানের প্রধান চিকিৎসক ডঃ চার্লস্ বেরী জানালেন,—মহাকাশচারীরা যে জল খেয়েছেন, তা' থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস দূর করতে না পারার জন্যে এই পেটব্যথা। লোমাটিল নামক পিল খেয়ে এই ব্যথা ওঁরা সারিয়ে ফেলুন।

ব্যথা সারানো হল অচিরেই। কিন্তু পেটের ভিতর থেকে হাইড্রোজেন বের করতে বেশ বেগ পেতে হল।

এদিকে উৎক্ষেপণের সময় থেকে প্রায় তিন দিন পেরিয়ে গেছে। মহাকাশযানটি চাঁদ থেকে মাত্র ৫,৬০০ মাইল দূরে এখন। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণশক্তির দৌলতে মহাকাশযানের গতি বেড়ে গিয়ে ঘণ্টায় ৫,৭০০ মাইলে দাঁড়িয়েছে।

মহাকাশচারীরা একটি যন্ত্রের সাহায্যে এই গতি হ্রাস করলেন। এবং এইবার ঘণ্টায় ৩,৭২০ মাইল বেগে যানটি ছুটতে লাগল।

এই গতিবেগেই চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করল মহাকাশযান। কক্ষ-পরিক্রমায় চাঁদ থেকে তার সর্বনিম্ন দূরত্ব দাঁড়াল ৭০ মাইল। দু'বার এইভাবে কক্ষ-পরিক্রমার পর প্রধান ইঞ্জিনটিতে আবার অগ্নিসংযোগ করা হল এবং এর ফলে চাঁদের চারপাশে বৃত্তাকার একটি পথ ধরে পরিক্রমা শুরু করল অ্যাপোলো-১০। চাঁদ থেকে মাত্র ৭০ মাইল দূরে এই পথ-পরিক্রমা শুরু হল।

এবার মূল মহাকাশযান বিচ্ছিন্ন করার পালা। চূড়ান্ত পর্যায়ের অভিযান শুরু করার পালা।

কিন্তু শুরুতেই এক বিপদ। দেখা গেল, চান্দ্রযান তার নির্দিষ্ট জায়গা থেকে তিন ডিগ্রী সরে গেছে। ফলে, উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে নির্দেশ দেওয়া হল, চান্দ্রযানটিকে যেন বিচ্ছিন্ন না করা হয়।

ওদিকে সারনান জানালেন,—ভয় নেই। ঠিক হয়ে গেছে সব। ঠিক সময়েই ইঞ্জিনটি চালু করা হয়। কল্পিত কক্ষপথের খুব কাছাকাছি পথ ধরেই আমরা ঘুরছি।

ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীতে চাঁদের ছবি পাঠালেন ওঁরা। রঙিন সব ছবি।

ওই ছবিগুলো টেলিভিশনে জীবন্ত হয়ে উঠল। চাঁদের গহ্বর ও পাহাড় পর্বতগুলো স্পষ্ট চোখে পড়ল ওখানে। একটি ছবিতে চোখে পড়ল চাঁদের কোনো এক পাহাড়ের চূড়া।

কিন্তু এর পরেই টেলিভিশন স্তব্ধ হয়ে যায় হঠাৎ। হঠাৎ শুরু হয় চাঁদের আকাশের নতুন খেলা। সারনান মূল মহাকাশযানটির সঙ্গে সংযুক্ত চান্দ্রযানটিতে পৌঁছুবার সুড়ঙ্গে প্রবেশ করেন।

এই সুড়ঙ্গ-পথটির ব্যাস ৩২ ইঞ্চি। অতএব, এতে প্রবেশ করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না সারনানকে।

কিন্তু সারনান চান্দ্রযানে প্রবেশ করার পর উৎক্ষেপণ-যানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ প্রথমত বিচ্ছিন্ন হয়। এই সময় উৎক্ষেপণযানটি থেকে বার বার আহ্বান আসে, সারনান! কথা বুঝতে পারছ কি আমাদের?

কথা প্রথমটায় বুঝতে পারেন না সারনান। এবং অনেক চেষ্টার পর যোগাযোগ-ব্যবস্থা তিনি পুনরুদ্ধার করেন।

ওদিকে স্ট্যাফোর্ড তাঁর আধ ঘণ্টা পরে চান্দ্রযানে প্রবেশ করেন। আর নিয়ন্ত্রণযানের চালক ইয়ং মূল মহাকাশযানটিতে থেকে যান।

স্ট্যাফোর্ড ও সারনান চান্দ্রযানটিকে মূল যান থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন এতক্ষণে। এতক্ষণে মানুষ নিয়ে দুটি মহাকাশযান স্বতন্ত্রভাবে চাঁদের কক্ষপথ-পরিক্রমা শুরু করেছে। এই পরিক্রমার পথে মহাকাশচারীরা যখন দ্বিতীয়বার চাঁদের নিম্নতম দূরত্বে পৌঁছুলেন, তখন তাঁরা চান্দ্রযানের নিম্নবর্তী অংশটিকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। তাঁরা নিজেরা তখন চান্দ্রযানের উচ্চতর অংশে চলে এলেন। চান্দ্রযানে এই স্থান-পরিবর্ত্তনের কারণ, আগামী দিনের চাঁদ-অভিযানে এই উচ্চতর অংশটির সাহায্যেই মহাকাশচারীদের চাঁদের জমি থেকে উঠিয়ে নেওয়া হবে।

এদিকে দেখতে দেখতে লক্ষ্যের দিকে নেমে আসে চান্দ্রযান। চাঁদের মাত্র ৯·৩ মাইল উপর দিয়ে প্রায় ৮ ঘণ্টা ধরে প্রতিবেশী উপগ্রহকে সে প্রদক্ষিণ করে।

দুই নভশ্চর স্ট্যাফোর্ড ও সারনান যতই এগিয়ে আসেন চাঁদের দিকে, ততই তাঁরা আবেগভরা কণ্ঠে তাঁদের দেখা দৃশ্যাবলীর ধারাবিবরণী পাঠাতে থাকেন।

এক সময় চান্দ্রযান 'স্নুপি' থেকে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। নভশ্চরদের একজন বলে ওঠেন, আমরা খুব নিচে নেমে আসছি এখন। চাঁদের খুব কাছে এসে গেছি। এখন আশ্চর্য সব দৃশ্য চোখে পড়ছে আমাদের। কখনও চোখে পড়ছে চন্দ্রপৃষ্ঠের খুব মসৃণ একটা জায়গা, আবার কখনও পড়ছে বড় বড় পাথরের চাঙড় এবং আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। এ ছাড়া বড় বড় পরিখা বা খাদও দেখতে পাচ্ছি আমরা। দেখছি, কোনো কোনো খাদ শ দুয়েক ফুট গভীর যেন; আর যেন খুব মসৃণ। ওরা দেখতে অনেকটা নিউ মেকসিকো বা আরিজোনার শুকনো মরুভূমির মতো।

একবার স্ট্যাফোর্ড বলে ওঠেন, অনেক রকম বিমান ও মহাকাশযান চালিয়েছি আমি। কিন্তু এই 'স্নুপি'র দোসর আর একটিও দেখি নি। বড় বেশি শব্দ আর গোলমাল করে সে। তার পাখা, পাম্প ও থার্সটারগুলো সারাক্ষণই ভীষণ আওয়াজ করে।

অবিশ্যি এই আওয়াজের মধ্যেই নিজের কাজ করে যান স্ট্যাফোর্ড। পৃথিবীতে রিপোর্ট পাঠান,—সারনান ও আমি যেসব সাদা ও কালো পাথরের চাঙড় দেখছি, তাদের কোনো কোনোটার ব্যাস প্রায় একশো ফুট হবে।

ওদিকে 'কণ্ট্রোল রুম'-এর বিশেষজ্ঞরা তখন এই একশো বা দু'শোর মারপ্যাঁচ নিয়ে ভাবছেন না। ওঁরা ভাবছেন নভশ্চরদের নিরাপত্তার কথা। ভাবছেন, পর পর কয়েকটি বিপদের মুখোমুখি হল এই 'স্নুপি'। নতুন আরও কোনো বিপদ ওৎ পেতে বসে নেই তো?

বিপদ দুটি যানের বিচ্ছেদের ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই দেখা দিয়েছিল

একবার ; এবং তখন দুটি যানেরই অক্সিজেন হ্রাস করতে হয়েছিল। কেন না, অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকলে অতিরিক্ত চাপে বিপদ ঘটার আশঙ্কা।

হাউস্টনের মাস্টার-কম্পিউটার সুড়ঙ্গ-পথের অক্সিজেনের পরিমাণ কমাবর নির্দেশ দিয়ে এ সমস্যার সমাধান করে। এছাড়া চান্দ্রযান 'স্নুপি'র সঙ্গে মূলযান 'চার্লিব্রাউন'-এর বেতার সংযোগও বিচ্ছিন্ন হয় বার বার। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দেয় তখন, যখন না-কি 'স্নুপি' হঠাৎ খুব জোরে লাটিমের মতো ঘুরতে শুরু করে।

ওই সময় সারনান-এর ওপর ছিল 'স্নুপি'কে নিয়ন্ত্রণের ভার। তিনি চীৎকার করে ওঠেন, নিশ্চয়ই 'স্নুপি' চন্দ্রপৃষ্ঠে নেমে যাচ্ছে।

—কিন্তু না! নামছে না সে!—কয়েক মুহূর্ত পরেই সারনান কণ্ট্রোল রুমকে আশ্বস্ত করেন। তাঁকে উত্তেজিতকণ্ঠে বলতে শোনা যায়,—'স্নুপি' নামছে না। আবার উঠে পড়েছে। ওফ! কী জংলী এই চান্দ্রযান'!

এদিকে ওই জংলীতে বসেই ছবি নেওয়া হয়। চাঁদের বিধ্বস্তভূমি ও রুক্ষ প্রান্তরগুলির ছবি।

অক্ষত থাকলে এইসব ছবি ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। আগামী জুলাই মাসে চাঁদে অবতরণভূমিটি বেছে নেওয়া হবে এদের থেকেই।

এছাড়া এই চান্দ্রযান খুব বড় রকমের একটি পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করল। এর চাঁদ-পরিক্রমা থেকে প্রমাণিত হল যে, চাঁদের পরিবেশে এ যান সচল থাকবে এবং চাঁদে অবতরণের যান হিসেবে এটিকে ব্যবহার করা যাবে।

মূল মহাকাশযান 'চার্লিং ব্রাউন'-এর সঙ্গে এর সংযুক্তিও নির্বিঘ্নে হয়। ভারতীয় সময় ২৩শে মের সকালে হয় এই সংযুক্তি। খবর

আসে, সংযুক্তির আগে অ্যাপোলো-১০-এর চান্দ্রযান মূল মহাকাশযানের সঙ্গে কিছুকাল ধরে চন্দ্রপরিক্রমা করে। এবং তারপর কক্ষপথে দুই যানের মিলন সম্পূর্ণ হলে নভশ্চররা বেতার-মারফত পৃথিবীতে এক সংক্ষিপ্ত বার্তা পাঠান। বলেন, 'স্নুপি' ও 'চার্লি ব্রাউন' এখন পরস্পরের সঙ্গে আলিঙ্গনে আবদ্ধ।

দলনায়ক স্ট্যাফোর্ড একবার বলে ওঠেন,—সুন্দর! অভিনব এই আয়োজন!

সত্যি, আয়োজনটা অভিনবই বটে। কেন না চাঁদের কক্ষপথেই মহাকাশচারীরা চান্দ্রযানটিকে মূল যানের সঙ্গে যুক্ত করেন। স্ট্যাফোর্ড ও সারনান সুড়ঙ্গপথ ধরে এগিয়ে আসেন মূল মহাকাশযানের দিকে; এবং তারপর দুটি যানের মধ্যে সংযোগকারী পথটিকে একেবারে রুদ্ধ করে দেন। চান্দ্রযানটিতে তখন আর কেউ নেই। তাকে তখন বিচ্ছিন্ন করে চাঁদের কক্ষপথে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ওদিকে মূল মহাকাশযানটি চাঁদ-পরিক্রমা শুরু করে আবার। ৩০ ঘণ্টায় আরও ১৫ বার সে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে।

মোট আড়াই দিন ধরে ৩১ বার চাঁদকে প্রদক্ষিণ করার পর অ্যাপোলো-১০-এর মহাকাশচারীরা পৃথিবীতে ফিরে আসার উদ্যোগ করেন। ২৪শে মে ভারতীয় সময় রাত ৩টা ৫৫ মিনিটে চাঁদের অভিকর্ষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে মহাকাশযানের মূল ইঞ্জিনটি চালু করেন ওঁরা। চালু করতে পূর্ব-নির্দিষ্ট ২ মিনিট ৪৪ সেকেণ্ডে সময়ই লাগে।

স্ট্যাফোর্ড জানান, এই চালু-করাটা খুব সুন্দরভাবে হয়েছে এবং আমরা চাঁদের এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখেছি। এখন পৃথিবীতে ফিরছি আমরা।

ওঁদের ফেরার খবর একটু দেরিতে পৌঁছয় আমাদের কাছে। কারণ অ্যাপোলো-১০-এর ইঞ্জিনটি যখন চালু হয়, সে তখন চাঁদের পিছনদিকে ছিল। তখন পৃথিবীর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না তার।

যানটি চাঁদের সামনের দিকে এসে বেতারসংকেত না পাঠানো পর্যন্ত পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের বন্ধুদের ৯ মিনিট সময় অসীম উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে কাটাতে হয়।

ওদিকে ইঞ্জিনটি চালু হবার কিছুক্ষণ পরেই মহাকাশচারীরা বেশি গরম হয়ে যাওয়া একটি জ্বালানির সেল বিচ্ছিন্ন করে দেন। তারপর ওঁরা ক্রমশ দূরে সরে যাওয়া চাঁদের ছবি পাঠাতে থাকেন পৃথিবীতে। ওঁরা ওঁদের টেলিভিশন ক্যামেরায় মহাকাশযানের জানালার দিকে তাক করে পৃথিবীবাসীদেরও চাঁদের দৃশ্য দেখান।

পৃথিবীর অনেকেই দেখে, চাঁদের দেশের হাজার হাজার এবড়ো-খেবড়ো আগ্নেয়গিরির মুখ। আর স্ট্যাফোর্ডকে বলতে শোনা যায়,—আমাদের কাছে চাঁদকে তামাটে বাদামী দেখাচ্ছে। আমরা এখন সেকেণ্ডে ৬,৩৪০ ফুট গতিবেগে পৃথিবীর দিকে এগোচ্ছি।

হ্যাঁ, এগোচ্ছেন। দ্রুত এগোচ্ছেন নভশ্চররা। পৃথিবীর অভিকর্ষের আওতায় এসে মহাকাশযানটির গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে।

সেই মুহূর্তে নভশ্চররা একবার জানান, 'গ্লাস-ফাইবার'-এর টুকরোয় এখনও ওঁদের গা হাত পা চুলকাচ্ছে। স্ট্যাফোর্ডের গায়ে চুলকানির মতো কী সব বেরিয়েছে।

কিন্তু স্ট্যাফোর্ডের ভ্রূক্ষেপ নেই কোনোদিকে। তাঁর মন তখন ঘরে-ফেরার আনন্দে মশগুল।

ওদিকে ঘর বড়ো থেকে বড়ো হচ্ছে ক্রমেই। ক্রমেই চেনা পৃথিবীটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। রকেটের গতিবেগ বাড়তে বাড়তে ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইলে এসে ঠেকছে।

এই গতিবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা হল অচিরেই; এবং অচিরেই সংবাদ পাওয়া গেল, অ্যাপোলো-১০ কেপ কেনেডি থেকে উৎক্ষেপণের ১৯২ ঘণ্টা ৩ মিনিট পরে ২৬শে মে ভারতীয় সময় রাত ১০টা ২২ মিনিটে প্রশান্ত মহাসাগরের যথানির্দিষ্ট স্থানেই অবতরণ করেছে।

এই অবতরণ এবং অ্যাপোলো-১০-এর সাফল্যমণ্ডিত অভিযানকে স্বাগত জানিয়ে মার্কিন গবেষণাকেন্দ্রের অফিসার-মহল বলেছেন,—এ প্রয়াস মানুষের চাঁদে পা দেবার পথকে প্রশস্ত করেছে। কিন্তু ঠিক কোন্ দিন মানুষ চাঁদে পা দেবে, তা' তাঁরা এখনই সঠিকভাবে বলতে পারছেন না।

এদিকে চাঁদ-অভিযানকে ঘিরে নতুন একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমেরিকার মহাকাশ-গবেষণাকেন্দ্রের বায়ো-মেডিক্যাল শাখার প্রধান ডাঃ ওয়াল্টার কামেরার বলেছেন, অ্যাপোলো ১১ মহাকাশযানের যাত্রীরা চাঁদ থেকে ফিরে আসার সময় এমন বিপজ্জনক সব রোগজীবাণু সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারেন যে, সে সব রোগের প্রতিষেধক-ব্যবস্থা না হলে পৃথিবীর সমস্ত জীবনই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

বৈজ্ঞানিকরা বলছেন, পৃথিবীর মানুষ পৃথিবীর পরিবেশ ও আবহাওয়াতেই চলেফিরে অভ্যস্ত। চাঁদের পরিবেশ ও আবহাওয়ার সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই। তাই চাঁদ থেকে কোনো রোগজীবাণু অবতরণকারী মহাকাশচারীর দেহে প্রবেশ করলে, সহজেই তাঁরা কাবু হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। এবং সে রোগ আবার ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা সারা পৃথিবীতে।

তবে চাঁদে এধরণের কোনো রোগ-জীবাণু আছে কিনা, তা এখনও সঠিকভাবে বলা যায় না। চাঁদের পরিবেশ, তাপমাত্রা, আলো এবং ব্যবহারযোগ্য জলের অভাব দেখে বরং মনে হয়, সেখানে জীবনের চিহ্নমাত্র নেই।

কিন্তু তবু সাবধান হতে দোষ কি! তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চাঁদে যাঁরা যাবেন, ফিরে আসার পর বেশ কয়েক সপ্তাহ তাঁদের আলাদা করে রাখা হবে, নানা রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রথমে জীবাণুমুক্ত করা হবে তাঁদের। অর্থাৎ, কোনো দিক দিয়েই আয়োজনের কোনো ত্রুটি নেই। অর্থাৎ, সত্যি আমরা চাঁদে চললাম, আমাদের সেলাম জানিয়ে রাখলাম চাঁদ-যাত্রীদের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু সেলাম জানাতে গিয়েও বাধা আসে যেন। কাদের যেন কান্না ভেসে আসে।

শুধোই, কে গো তোমরা? কাঁদছ কেন?

জবাব পাই, আমরা পৃথিবীর ২০০ কোটি বুভুক্ষু। খেতে পাই নি কিনা। তাই কাঁদছি।

—কিন্তু কাঁদবে তাই বলে?—ওদের বোঝাবার চেষ্টা করি,— খানার চেয়ে কি জানা বড় নয়? অজানাকে জানবো বলে আমরা যে চাঁদে চললাম গো!

ওরা বলে, তা' যাও। কিন্তু আমরা যে অভাবে-অভিযোগে নরকে চললাম। চাঁদের বাজেট থেকে বাঁচিয়ে দু'-চার পয়সা—

ওদের থামিয়ে দিয়ে বলি, তোমাদের দেয়ার কথা বলছ তো? দিলেও লাভ হত না কিছু।

—কী বললে? লাভ হত না?—পৃথিবীর রুগ্ন ও বুভুক্ষুরা হাহাকার করে ওঠে একসঙ্গে। একসঙ্গে ওরা কত কী বলতে চায়।

কিন্তু ওদের কথায় কান দিলে চলে কি? পৃথিবীর জ্ঞানের ভাণ্ডার কি ওতে সম্পূর্ণ হয়? তাই কথা শেষ হবার আগেই 'টা টা' করে উঠি আমরা। পর্বতপ্রমাণ দর্প আর সমুদ্রপ্রমাণ খুশি বুকে নিয়ে বলি, আমরা চাঁদে চললাম।

মানুষ-বাহী মহাকাশযান সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য

মহাকাশযানের নাম	যে-দেশ যান পাঠিয়েছে	তারিখ	মহাকাশচারীদের নাম	পৃথিবী প্রদক্ষিণ কতবার হয়েছে	প্রদক্ষিণ-কাল বা মহাশূন্যে বিচরণের মোট সময়
ভোস্টক ১	রাশিয়া	১২ই এপ্রিল, ১৯৬১	গ্যাগারিন	১	১ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট
ফ্রীডম্ ৭ *	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৫ই মে, ১৯৬১	শেফার্ড		১৫ মিনিট
লিবার্টি বেল্ ৭ *	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২১শে জুলাই, ১৯৬১	গ্রীসম্		১৬ মিনিট
ভোস্টক ২	রাশিয়া	৬-৭ই আগস্ট, ১৯৬১	টিটভ্	১৭	২৫ ঘণ্টা ১৮ মিনিট
ফ্রেণ্ড্‌সিপ্ ৭	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২	গ্লেন্	৩	৪ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট
অরোরা ৭	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২৪শে মে, ১৯৬২	কার্পেণ্টার	৩	৪ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট
ভোস্টক ৩	রাশিয়া	১১-১৫ই আগস্ট, ১৯৬২	নিকোলাইয়েভ্	৬৪	৯৪ ঘণ্টা ২২ মিনিট
ভোস্টক ৪	রাশিয়া	১২-১৫ই আগস্ট, ১৯৬২	পপোভিচ্	৪৮	৭০ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট
সিগ্‌মা ৭	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩রা অক্টোবর, ১৯৬২	সীরা	৬	৯ ঘণ্টা ১৩ মিনিট
ফেইথ্ ৭	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৫-১৬ই মে, ১৯৬৩	কুপার	২২	৩৪ ঘণ্টা ২০ মিনিট
ভোস্টক ৫	রাশিয়া	১৪-১৯শে জুন, ১৯৬৩	বাইকভস্কি	৮১	১১৯ ঘণ্টা ৬ মিনিট
ভোস্টক ৬	রাশিয়া	১৬-১৯শে জুন, ১৯৬৩	তেরেশকোভা	৪৮	৭০ ঘণ্টা ৫০ মিনিট

মহাকাশযানের নাম	যে-দেশ যান পাঠিয়েছে	তারিখ	মহাকাশচারীদের নাম	পৃথিবী-প্রদক্ষিণ কতবার হয়েছে	প্রদক্ষিণ-কাল বা মহাশূন্যে বিচরণের মোট সময়
ভোস্কড্ ১	রাশিয়া	১২-১৩ই অক্টোবর, ১৯৬৪	ফিয়োকটিস্টভ্ কোমারভ্ ইয়েগোরভ্	১৬	২৪ ঘণ্টা ১৭ মিনিট
ডাস্কড্ ২	রাশিয়া	১৮-১৯শে মার্চ, ১৯৬৫	বেলিস্ইয়েভ্ আইয়োগভ্	১৭	২৬ ঘণ্টা ২ মিনিট
জেমিনি ৩	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২৩শে মার্চ, ১৯৬৫	গ্রীসম্ ইয়ং	৩	৪ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট
জেমিনি ৪	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩-৭ই জুন, ১৯৬৫	ম্যাক্ডিভিট্ হোয়াইট্	৬২	৯৭ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট
জেমিনি ৫	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২১-২৯শে আগস্ট, ১৯৬৫	কুপার কন্রাড্	১২০	১৯০ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট
জেমিনি ৭	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৪-১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৬৫	বোরম্যান্ লোভেল্	২০৬	৩৩০ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট

মহাকাশযানের নাম	যে-দেশ যান পাঠিয়েছে	তারিখ	মহাকাশচারীদের নাম	পৃথিবী-প্রদক্ষিণ কতবার হয়েছে	প্রদক্ষিণ-কাল বা মহাশূন্যে বিচরণের মোট সময়
জেমিনি ৬	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৫-১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৬৫	সিরা স্ট্যাফোর্ড	১৫	২৫ ঘণ্টা ৫১ মিনিট
জেমিনি ৮	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৬ই মার্চ, ১৯৬৬	আর্মস্ট্রং স্কট্	৬½	১০ ঘণ্টা ৪২ মিনিট
জেমিনি ৯	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩-৬ই জুন, ১৯৬৬	স্ট্যাফোর্ড সারনান্	৪৪	৭২ ঘণ্টা ২১ মিনিট
জেমিনি ১০	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৮-২১শে জুলাই, ১৯৬৬	ইয়ং কলিন্স্	৪৩	৭০ ঘণ্টা ৪৭ নিনিট
জেমিনি ১১	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১২-১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬	কন্রাড্ গর্ডন্	৪৪	৭১ ঘণ্টা ১৭ মিনিট
জেমিনি ১২	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১১-১৫ই নবেম্বর, ১৯৬৬	লোভেল্ অল্ড্রিন্	৫৯	৯৪ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট
সয়ুজ ১ * *	রাশিয়া	২২-২৩শে এপ্রিল, ১৯৬৭	কোমারভ্	১৮	২৬ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট

মহাকাশযানের নাম	যে-দেশ যান পাঠিয়েছে	তারিখ	মহাকাশচারীদের নাম	পৃথিবী-প্রদক্ষিণ কতবার হয়েছে	প্রদক্ষিণ-কাল বা মহাশূন্যে বিচরণের মোট সময়
অ্যাপোলো ৭	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১১-২২শে অক্টোবর ১৯৬৮	সীরা ইয়াইসেল্ কানিংহাম্	১৬৩	২৬০ ঘণ্টা ৯ মিনিট
সয়ুজ ৩	রাশিয়া	২৬-৩০শে অক্টোবর, ১৯৬৮	বেরেগোভম্	৬১	৯৪ ঘণ্টা ৫১ মিনিট
অ্যাপোলো ৮ ***	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২২-২৭শে ডিসেম্বর ১৯৬৮	বোরম্যান্ লোভেল্ অ্যাণ্ডার্স		১৪৭ ঘণ্টা
অ্যাপোলো ৯ †	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩-১৩ই মার্চ, ১৯৬৯	ম্যাক্‌ডিভিট স্কট লোথাইকাট	১৪৯	৯ দিন ২২ ঘণ্টা ৪০ মিঃ
অ্যাপোলো ১০ ††	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১৮-২৬শে মে, ১৯৬৯	স্ট্যাফোর্ড ইয়ং সারনান		৯ মিনিট কম আট দিন

* পৃথিবী-প্রদক্ষিণ অসম্পূর্ণ।

** এই মহাকাশযানটি পৃথিবীতে অবতরণের সময় দুর্ঘটনায় নিহত হন মহাকাশচারী কোমারভ্।

*** এইমহাকাশযানটি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে কাটিয়ে চন্দ্রলোক অভিমুখে যাত্রা করে এবং ২৯ ঘণ্টায় ১০ বার চন্দ্র-প্রদক্ষিণ করে।

† ১০ দিন ধরে পৃথিবী-প্রদক্ষিণকারী এই মহাকাশযানটির সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে, মহাশূন্যে মূলযান থেকে চান্দ্রযানে যাতায়াত করা সম্ভবপর।

†† এই মহাকাশযানটির তিন দিন সময় লাগে চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছুতে। প্রায় আড়াই দিন চাঁদের কক্ষপথে কাটে এর এবং এরই সহায়তায় চান্দ্রযানে করে স্ট্যাফোর্ড ও সারনান চাঁদের ১০ মাইল মাত্র দূরে নেমে আসেন। পৃথিবীতে ফিরে আসতে এর সময় লাগে ২ দিনের কিছু বেশি।